শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদিত

প্রকাশক—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গ্রন্থলিখন

আরম্ভ : ২০ মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩

সমাপ্তি : ৩০ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪৩

লিপিকার

শ্রীশংকরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল

অনুলিপিকার

শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র

প্রথম সংস্করণ

১২ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫০

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৬ চৈত্র, বুধবার, ১৩৬১

মুদ্রাকর

শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস

৭৯এ, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য—৩৷৷০ টাকা

রায় দাদাকে
প্রণাম।

তানি (মোহন)

মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত

রামচন্দ্র দত্ত ১২৫৮ সালে কলিকাতার পূর্বভাগে নারিকেলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত, মাতার নাম তুলসীমণি। অল্প বয়সেই রামচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃহীন শিশুকে আত্মীয়েরা লালন-পালন করিতে থাকেন।

নৃসিংহপ্রসাদ প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু, দৈব-দুর্বিপাকে সে সকলই নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তিনি বিশ্বনাথ দত্তের (গ্রন্থকারের পিতার) শিমলার বাটীতে আসিয়া বাস করেন। নৃসিংহ-প্রসাদ, সম্পর্কে, বিশ্বনাথ দত্তের সহধর্মিণী ভুবনেশ্বরী দেবীর দাদামহাশয় ছিলেন। বিশ্বনাথ ও তাঁহার সহধর্মিণী রামচন্দ্রকে আপনাদের ছেলের মতো মানুষ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও রামচন্দ্রকে বড় ভাই-এর মতো দেখিতেন ও তাঁহাকে 'রামদাদা' বলিয়া ডাকিতেন। রামচন্দ্র গ্রন্থকারকে 'চনি' বলিয়া ডাকিতেন।

রামচন্দ্র ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারি পাস করেন। পরে, তিনি বাংলা সরকারের রাসায়নিক পরীক্ষকের প্রধান সহকারী হইয়াছিলেন। অধ্যবসায়গুণে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। রসায়ন সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি ক-একখানি গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিও রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থও উপার্জন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র দয়া, পরোপকার প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে ও সংশ্রয়ে রামচন্দ্রের ধর্মজীবনের গতি এক বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়। গুরুর প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি তাঁহার ধর্মজীবনকে অপূর্বশ্রী-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম ও ভাব প্রচার-প্রচেষ্টায়, প্রথমকালে, রামচন্দ্রই ছিলেন অধিনায়ক।

১৩০৫ সালে রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

কৃতজ্ঞতা

পূজনীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বহু অমূল্য পাণ্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বর্তমান পুস্তকখানি সেগুলিরই অন্যতম। ক-একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহৃদয় ব্যক্তির আগ্রহ ও সাহায্য ব্যতীত এই পুস্তকখানি আজ প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। তন্মধ্যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর শ্রীরামচন্দ্র শেঠ, বি. এল., এবং প্রিয়ভাষী কর্মী ডাঃ শ্রীবংকিমচন্দ্র শেঠ মহাশয়দ্বয়ের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী শ্রীমতী নন্দরাণী শেঠ মহাশয়া অর্থসাহায্য দ্বারা আমাদিগের এই পুস্তক প্রকাশনের ব্যয়ভার বহুল অংশে লাঘব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল, শ্রীশংকরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশ-চন্দ্র মিত্র, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এ., কাব্যসাংখ্যতীর্থ, মহাশয়গণ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, প্রুফ-সংশোধন ও আনুষঙ্গিক কার্যে বহু অধ্যবসায় ও ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ, এম. এ., শিল্পী শ্রীনির্মলকুমার দে ও শ্রীমনোরঞ্জন দাস মহাশয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে অতি আন্তরিকভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকা-নন্দের ছবি দুইখানি আমরা 'উদ্বোধন' কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এবং মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের ছবিখানি আমরা তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র ডাঃ শ্রীসতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি। পরবর্তী ছবিখানি সম্বন্ধে এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, মূল ফোটোখানি সামান্যমাত্র পরিবর্তিতরূপে মুদ্রিত করা হইয়াছে। 'কিশোর বাংলা'-র কর্তৃপক্ষের নিকটে আমরা ক-একটি বিষয় সাহায্যলাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছি। ক্যালকাটা ইউনাইটেড প্রিণ্টার্স লিমিটেডের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীমণীন্দ্র-নাথ দে মহাশয়ও তাঁহার পরামর্শ-সাহায্যাদি দ্বারা আমাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। পরিশেষে, ইহা বিশেষরূপে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে

ঐ

এই পুস্তকখানি বর্তমানে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস আমাদিগের পক্ষে মোটেই সহজ হইত না। ইহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি, এবং আরো যে-সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুধীজন অলক্ষ্যে থাকিয়া এই পুস্তক প্রকাশনে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি, আমরা গুণমুগ্ধচিত্তে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি,

প্রথম সংস্করণ
১২ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫০

বিনীত প্রকাশক
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রসঙ্গে

সুধী পাঠকদের কাছে পূজনীয় গ্রন্থকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মশাই-এর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই গ্রন্থের সকল খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলাও নিষ্প্রয়োজন; মাত্র দু-একটি বিষয় সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করি।

গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গ্রন্থখানি লিখেছেন, তা তাঁর 'নিবেদন'-এ সুস্পষ্ট। গ্রন্থখানি জীবনী নয়, জীবনী-চিন্তন—সুপ্রাচীন গ্রন্থকারের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনুধ্যান। এজন্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল জীবন-বৃত্তান্ত যে পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে প্রথমেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বহু দিক্ বিভিন্ন মনীষী, এর পূর্বে, পর্যালোচনা করেছেন; কিন্তু তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও মনোবৃত্তি ঠিক এ রকম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র সহায়ে কেউ ব্যাপক-ভাবে আলোচনা করেছেন কি-না জানি না। অন্যান্য বহু বিষয়েও গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাও তীক্ষ্ণদর্শী পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন।

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, প্রচলিত বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত স্বকীয় মতবাদসমূহের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ ও মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করেছেন। এ সকল বিভিন্ন দুরূহ মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি স্বতন্ত্র বিশদ গ্রন্থও আছে; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, সেগুলির অধিকাংশই নানা কারণে আজও অপ্রকাশিত রয়েছে।

আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, গ্রন্থকার কোনো বস্তু বা কোনো বিষয়ের নির্দিষ্ট সীমারেখা টানেন নি এবং তাদের পারস্পরিক বিরোধের কথাও বলেন নি। প্রকৃত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মতো তিনি সকল বস্তু ও সকল বিষয়ের মধ্যে একটি প্রাণময় যোগসূত্র বার করবার প্রয়াস পেয়ে এক মহামিলনের—পূর্ণতার বাণীই শুনিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী—শক্তির উৎস, তা কখনো রুদ্ধ হবার নয়; তাঁর বাণী—ব্রহ্মবীজ, তাও কখনো নষ্ট হবার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মনীষীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে; তাঁর জীবনী ও বাণী মানব-জাতির সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো একজন পুরুষের জীবনের প্রতিটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করার এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ ও সমীক্ষণ করার প্রয়োজনও তাই সমধিক। এজন্যে, গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সঞ্চিত স্মৃতি—দৃষ্ট ঘটনা ও উপলব্ধ বিষয়সমূহের কিছু লিপিবদ্ধ করে সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ স্মৃতি-লেখার ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই, অধিকন্তু, সত্যানুসন্ধিৎসু জনের কাছে এর সার্থকতা যথেষ্ট। আর, বহুশাস্ত্রবিৎ বহুদর্শী গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণের কল্যাণপ্রদ জীবনের বিশেষ একটি দিক্, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, পর্যালোচনা করে যে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন, এখন না হোক, কালে নিশ্চয়ই তা দেশ-বিদেশের স্বাধীন-চিন্তাশীল মনীষীদের গভীর ধ্যানের বিষয় হবে, এবং তাঁদের এই ধ্যানপ্রসূত সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে ভবিষ্য মানব-সমাজ যে প্রভূত উপকৃত হবে, তাও সুনিশ্চিত।

পরিশেষে, যাঁদের সাহচর্য ও সহানুভূতিতে, যুদ্ধের দরুন বর্তমান ওলটপালট অবস্থায় বহু অসুবিধার মধ্যেও, এই গ্রন্থ-সম্পাদন সম্ভব হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রতি, কোনো রকম লৌকিকতা না করে, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ন্যস্ত কর্মভার সম্পাদনে অনবধানতাবশতঃ যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তো সে দোষ আমার; ক্ষমাশীল পাঠকদের কাছে সেজন্যে মার্জনা ভিক্ষা করি।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু

নিবেদন

পরমহংস মশাই মাঝে মাঝে, বোধ হয় ১৮৮২ বা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত, রামদাদার বাড়িতে আসিয়া অনেক কথাবার্তা কহিয়াছিলেন। আমি যদিও অনেক সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতাম, কিন্তু তখন আমার বয়স অল্প হওয়ায়, সেই সকল কথার অর্থ বিশেষ বুঝিতে পারি নাই; আর, অনেক দিনকার ঘটনা হওয়ায়, এখন সেই সকল কথাবার্তা বিশেষ কিছু স্মরণও নাই। বোধ হয়, অপরেও সেই সকল কথাবার্তা বিশেষ কিছু স্মরণ করিয়া রাখেন নাই, বা সেই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। সেই সকল ঘটনার যে বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে, এবং পরে যে সেগুলির বিশেষ কোনো মূল্য হইবে, এ বিষয় তখন কেহ চিন্তাও করেন নাই। সকলেই এই সকল ঘটনা অতি সাধারণ ব্যাপার মনে করিতেন বলিয়া, পরমহংস মশাই-এর কথাবার্তা বিশেষ মন দিয়া শুনেন নাই, বা বিশেষ কিছু লিখিয়া রাখেন নাই। এইজন্য, এ বিষয় অতি সামান্যভাবে যাহা আমার স্মরণ আছে, তাহা এ স্থলে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; আর, সেই সময় পরমহংস মশাই-এর যেরূপ ভাব-ভঙ্গী দেখিয়াছি, এবং তাহা দেখিয়া, আমার মনে যে প্রকার ভাবের উদয় হইত, তাহা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অনেক দিনকার পুরানো কথা হওয়ায়, প্রত্যেক বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মনে আনিতে পারিতেছি না; তবে যেটুকু পারিতেছি ও ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে, কেবল সেইটুকুই বিবৃত করিতেছি। ঠিক পর পর কোন্ দিন কি ঘটিয়াছিল, এবং কথাবার্তাকালে, পরমহংস মশাই বা অন্য কেহ, ঠিক যে কি ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও স্মৃতিতে আনিতে পারিতেছি না। এইজন্য, বিবৃত ঘটনাগুলির আগু-পাছু হইয়া যাওয়া সম্ভব এবং কথাবার্তার ভাষাও বদলাইয়া যাওয়া সম্ভব। যে সকল ঘটনা

আমি নিজ চক্ষে দেখি নাই, সেগুলি অপরের মুখে যেমন শুনিয়াছি, তেমন লিখিয়াছি; কিন্তু, সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই।

এই গ্রন্থের পূর্ব ভাগে, অন্যান্য বিষয়ের সহিত, পরমহংস মশাই-এর জীবনের কতকগুলি ঘটনা ও প্রক্রিয়ার বিষয় সন্নিবেশ করা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি বিশ্লেষণ করা হয় নাই। পরমহংস মশাই-এর ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করিলে, তিনি যে এক অতীব মহান্ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাহা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; কারণ, তিনি নিজ অনুভূত বহু নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের জীবন্ত রূপ দিয়াছিলেন। পরমহংস মশাই-এর ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিলে অনেক প্রকার নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইজন্য, আমি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতের সাহায্যে তাহার ক-একটি মাত্র অতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, কারণ, সবগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে স্বতন্ত্রভাবে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক। আমি যেগুলি বিশ্লেষণ করিয়াছি, সেগুলি গ্রন্থের উত্তর ভাগে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহাতে যদি ভ্রম হয়, তবে সে ত্রুটি আমার; কারণ আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে ও সামান্য বুদ্ধিতে তাঁহার সম্বন্ধে অল্পমাত্র যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই এ স্থলে প্রকাশ করিয়াছি।

পরমহংস মশাই-এর মতো আদর্শপুরুষের বিষয় কোনো কিছু বলা অতীব দুরূহ। পরমহংস মশাই-এর যে বহুবিধ ভাব ও বহুবিধ শক্তি ছিল, আমরা সে সকল কিছুই নির্ণয় করিতে পারি নাই। ভক্তিমার্গের লোকেরা তাঁহাকে মহাভক্ত বলিতেন; জ্ঞানমার্গের লোকেরা তাঁহাকে মহাজ্ঞানী বলিতেন; দার্শনিকগণ তাঁহাকে দর্শনশাস্ত্রের প্রতিমূর্তি বলিতেন; বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রমাণপুরুষ বলিতেন; এবং অন্যান্য মতাবলম্বিগণও তাঁহাকে নিজ নিজ মতের আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। পরমহংস মশাই-এর বিষয় অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আরো অধিকসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশ করা আবশ্যক; কারণ, তাহা হইলে, তাঁহার জীবনী বিশদভাবে

আলোচিত হইতে পারে এবং বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থ পাঠে যদি কাহারো কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে, আমার শ্রম সার্থক হইল মনে করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি
১২ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৫০
৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা

বিনীত,
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

উত্তর ভাগ

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

চিত্রসূচী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

পূর্ব ভাগ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

মহাপুরুষদিগের বাণী

মহাপুরুষদিগের বাণীসমূহ পর্যালোচনা করিলে, আমরা তিন শ্রেণীর বাণী দেখিতে পাই।

এক প্রকার বাণী হইল—বিধিমূলক। এই সকল সময়োপযোগী বিধি অবলম্বন ও প্রতিপালন করিলে, মানবের অশেষ হিতসাধন হইতে পারে। এইজন্য, তাঁহারা অনেকগুলি বিধি-বাক্যের নির্দেশ দিয়া যান।

অপর এক প্রকার বাণী হইল—নিষেধমূলক। সমাজে যে সকল দুর্নীতির প্রচলন রহিয়াছে এবং যে সকল কারণের জন্য সমাজে বিশৃঙ্খলতা আসিয়াছে ও মানব-মন নিম্নগামী হইয়াছে, সেই সকল দুর্নীতি দূর করিবার জন্য, মহাপুরুষগণ উপদেশচ্ছলে, বাল্য-উপাখ্যান, রূপকথা প্রভৃতি দিয়া কতকগুলি নিষেধ-বাণী কহিয়া থাকেন। উচ্চমনা ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ, মানবজীবনের কদর্য ভাবসমূহ দেখিয়া ব্যথিত হইয়া, নানারূপ নিষেধ-বাণী কহিয়া যান। সেগুলি পালন করিলে ভবিষ্য সমাজের মঙ্গল হইতে পারে।

বিধি-বাক্য ও নিষেধ-বাণী, দুই-ই হইল স্থানীয় ও সাময়িক ব্যাপার। সমাজের দুর্নীতি তিরোহিত হইলে, এই সকল বিধি ও নিষেধ তত ফলদায়ক হয় না; এমন কি,

ক-এক শত বৎসর পর, এই সকল বিধি ও নিষেধ, অল্প বা অধিক পরিমাণে, পরিবর্তন করিতে হয়। এই সকল বিধি ও নিষেধ চিরস্থায়ী—এ কথা কেহ যেন মনে না করেন। এ সকলই হইল দেশ-কাল ইত্যাদির অন্তর্গত; এইজন্য, ইহাদের কার্যকারিতা বা সার্থকতা মাত্র কিছু কালের জন্য থাকে। কিছু কাল পরে, ইহারা আপনা-আপনি নিষ্ফল হইয়া যায়, এবং তখন, এই সকল বিধি ও নিষেধের পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

মহাপুরুষদিগের আর এক প্রকার বাণী আছে, যাহা শাশ্বত ও সার্বভৌম। এইরূপ বাণী Transcendentalism বা 'অনুত্তর, সম্যক্ সম্বোধি'-র ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। বিধিমূলক ও নিষেধমূলক বাণীসমূহ ভবিষ্যতে যেরূপ লুপ্ত হইয়া যায়, এই নিত্য ও বিশ্বব্যাপী বাণীগুলি সেরূপ লুপ্ত হইয়া যায় না। এইগুলি চিরস্থায়ী ও কালজয়ী। এইজন্য, এইরূপ বাণী সর্ব স্থানে, সর্ব দেশে ও সর্ব জাতির ভিতর প্রয়োজ্য।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক পাঠ করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, চিন্তাশীল বুদ্ধদেব, সমাজে যে সকল দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সকল দূরীকরণ করিবার জন্য কতকগুলি বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করিতেছেন। বুদ্ধদেবের যে বাণী—"জাতি, জরা, মৃত্যু নিরাকরণ করিব; অনুত্তর, সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিব", তাহা চিরন্তন। বুদ্ধদেবের 'দ্বাদশ নিদান'-ও † সনাতন।

† ১. অবিদ্যা। ২. সংস্কার। ৩. বিজ্ঞান। ৪. নাম-রূপ। ৫. ষড়ায়তন। ৬. স্পর্শ। ৭. বেদনা। ৮. তৃষ্ণা। ৯. উপাদান। ১০. ভব। ১১. জাতি ১২. জরা, মৃত্যু, দুঃখ, দৌর্মনস্য। পরস্পর পরম্পরের কারণ বলিয়া, এইগুলির নাম

প্রভু যীশুর বাণী বা উক্তি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অনেক স্থানে সামাজিক প্রথা এবং অন্যান্য প্রথাসমূহ প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যীশুর বাণী এবং ইহুদীদিগের ইতিহাস একত্র পাঠ করিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইহুদী সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল এবং কিরূপ দূষণীয় আচার-পদ্ধতি ইহুদী সমাজে প্রচলিত ছিল। সেইজন্য, চিন্তাশীল যীশু এই সকল নিষেধ করিতেছেন।

মহাপণ্ডিত তীক্ষ্ণধী ও ওজস্বী পল[১] যদিও জীবনের প্রথম অবস্থায় যীশুর সম্প্রদায়ের পরম বিরোধী ছিলেন এবং যীশুর অন্তেবাসীদিগকে নানা প্রকার নির্যাতন করিয়াছিলেন, কিন্তু, দামাস্কাস যাত্রাকালে, যখন শূন্যপথে যীশুর দেখা

'নিদান'। বোধিবৃক্ষমূলে তপস্যাকালে বুদ্ধদেব সৃষ্টির আদিকারণ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, এই দ্বাদশ নিদান কার্য-কারণ-তত্ত্বের বিষয় ও পরিণাম।

১ মহাত্মা পল-এর পূর্বকার নাম ছিল 'সল'। প্রথম জীবনে তিনি ঘোর খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট-অনুচরগণকে নির্যাতন করিবার মানসে দামাস্কাস-এর নিকট পৌঁছিলে, অকস্মাৎ, আকাশ হইতে তাঁহার চতুর্দিকে এক জ্যোতি দীপ্তি পাইল। সল ভূমিতে পড়িয়া যাইলেন এবং একটি বাণী শুনিতে পাইলেন—"সল, সল, তুমি আমাকে নির্যাতন করিতেছ কেন?" সল জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আপনি কে?" উত্তর হইল, "আমি সেই যীশু, তুমি যাঁহাকে নির্যাতন করিতেছ; কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার পক্ষে দুষ্কর।" সল আশ্চর্যান্বিত হইয়া কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, আপনার কি ইচ্ছা? আমি কি করিব?" প্রভু বলিলেন, "তুমি উঠিয়া শহরে যাও, যাহা করিতে হইবে, পরে জানিতে পারিবে।"

সল-এর সহগামিগণ কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া এবং এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সল ভূমি হইতে উঠিলেন এবং নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সহগামিগণ তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে দামাস্কাস শহরে লইয়া যাইলেন। সল তিন দিন দৃষ্টিহীন অবস্থায় ছিলেন এবং কোনো-কিছু আহার বা পান করেন নাই।

সল, পরে, খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সেণ্ট পল, অর্থাৎ, সাধু পল নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

পাইলেন, তখন হইতে তিনি যীশুর ভক্ত হইলেন। পল বিরক্ত হইয়া, স্থবির ও সংকীর্ণ ইহুদী সমাজ পরিত্যাগ করিয়া, গ্রীক ও রোমান সমাজের আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া উদার ভাব প্রচার করিলেন, যাহাতে যীশুর ভাবসমূহ জগতের সর্বত্র প্রচারিত হইতে পারে। এইজন্য, জগতে খ্রীষ্টীয় ধর্মের এত প্রচার হইয়াছিল।

এই স্থানে ইহা জানা আবশ্যক যে, যীশুর নামে প্রচলিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে আমরা অনেক সময় সন্দিহান হইয়া থাকি যে, কোন্ ভাবটি যীশুর ছিল এবং কোন্ ভাবটিই বা পল-এর ভাবের ছায়া অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে। কারণ, পল-এর ভাব প্রচারিত হইয়া দৃঢ়ীভূত হইবার পর, যীশুর ক-একখানি জীবনী লিখিত হয়। এইজন্য, পল-প্রণোদিত যীশুর ভাবমাত্র আমরা গ্রন্থে পাই, কিন্তু যীশুর আসল ভাব যে কি ছিল, তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক, সমাজকে পরিবর্ধিত করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সে বিষয় যীশু ও পল উভয়েই চিন্তা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও, আমরা এইরূপ তিন শ্রেণীর বাণী দেখিতে পাই। সমাজের দুর্নীতি-সমূহ স্বচক্ষে দেখিয়া, বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিয়া তিনি কতকগুলি বিধি-নিষেধ নির্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত ভাবগুলি একসঙ্গে মিলাইলে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার তাৎপর্য বুঝিতে অসুবিধা হইতে পারে, এবং মনে চাঞ্চল্য আসিতে পারে; কারণ, সব ভাবগুলি, সকল সময়ে ও সকল দেশে প্রয়োজ্য নয়। এইজন্য, স্বামী বিবেকানন্দ বহু বৎসর চিন্তা করিয়া আরো কতকগুলি বিধি-নিষেধ

প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং নিজের ধীশক্তি দিয়া অনেক প্রকার নূতন ভাব প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এইরূপ বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করিলেন? পূর্বতন মহাপুরুষগণ যে ঠিক এইভাবে বিধি-নিষেধ করেন নাই এবং এইভাবে কথা বলেন নাই, ইহারই বা তাৎপর্য কি?—ইহার কারণ বুঝিতে হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণের সময় কলিকাতার ও বাংলাদেশের সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বিষয় কিছু জানা আবশ্যক। কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও বাণী পাঠ করিলেই সেগুলির সার্থকতা বুঝা যায় না। সমাজের অবস্থা অবগত না হইলে, চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোভাব বুঝা সম্ভবপর নয়।

সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক কি? —সমাজ ব্যক্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে; সমাজের নানা প্রকার চঞ্চল ভাব হইতে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সমাজের ভাব চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ না হইলে, চিন্তাশীল ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি উদ্ভূত হইতে পারেন না। সমাজ আবশ্যক শক্তিপুঞ্জ কেন্দ্রীভূত করিলে, মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে, এই মহাপুরুষই সমাজকে পরিচালন করিয়া থাকেন। A great man is the outcome of revolution, fulfils the revolution and is the father of future ages—অর্থাৎ, মহাপুরুষ বিপ্লবের পরিণতি, বিপ্লবকে পূর্ণতা দান করেন, এবং ভবিষ্য যুগের স্রষ্টা।

সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে ইহাই হইল পরস্পর সম্পর্ক।

পুরাতন বাংলার সমাজ

পুরানো বাংলার সমাজের অবস্থা অতীব কদর্য ও জঘন্য হইলেও, আমি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। কারণ,

সেই সময়কার সমাজের বিষয় অবগত হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও বাণীসমূহের সার্থকতা বুঝা যাইবে এবং তাঁহার আবির্ভাবের কারণও বুঝা যাইবে।

আমরা যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই সময় পুরানো বাংলার অবসান হইতেছে এবং নূতন বাংলা উঠিতেছে। এইরূপ সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে আমরা আসিয়াছি। আমরা সমাজের অতি জঘন্য অবস্থাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং স্বচক্ষে এমন অনেক বিষয় দেখিয়াছি, যাহা এখনকার সহিত তুলনা করিলে লোকে হাসিবে ও অবজ্ঞা করিবে। আর, সমাজের এত দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে যে, এখনকার লোকেরা সে-সকল কথা বিশ্বাস করিতেই পারিবে না।

কলিকাতার তখনকার সমাজ বুঝিতে হইলে, দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'সধবার একাদশী' গ্রন্থখানি পাঠ করা আবশ্যক। ইহা পাঠ করিলে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভিতর কিরূপ বিপর্যস্ত ভাব আসিয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। তখনকার সমাজের অতি সুন্দর চিত্র ইহাতে আছে। অপর একখানি গ্রন্থ হইল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'চৈতন্য-লীলা'। ইহাতে জগাই ও মাধাই-এর যে অংশ আছে, তাহা গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পর্য-বেক্ষিত সমাজের প্রতিচিত্র। আমরাও ঠিক এইরূপ দেখিয়াছি। চৈতন্য-লীলাতে জগাই ও মাধাই-এর যে চরিত্র দেখানো হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে গিরিশচন্দ্রের নিজ চরিত্রেরই রূপান্তর। জগাই ও মাধাই হইলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ও তাঁহার এক বন্ধু, নাম পরিবর্তিত মাত্র। গিরিশচন্দ্র প্রণীত 'সীতার বিবাহ' গ্রন্থে সমাজের আর একটি আলেখ্য পাওয়া যায়। আমরা ছেলেবেলায় কলিকাতার সমাজের অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছি, তাহার নিখুঁত চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়।

আলমবাজারের মঠে বড় ঘরটিতে, সন্ধ্যার পর, রাখাল

মহারাজ[১] ও আমি বসিয়া আছি; এমন সময়, * * মুখুজ্যে ও তাঁহার ছেলে আসিলেন। রাখাল মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তো আগে এত ষণ্ডা ছিলে, তবে এত পটকে গেলে কেন?" * * মুখুজ্যে তাঁহার ছেলের সম্মুখেই নিজ জীবনের পূর্ব কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আর দাদা, ছ-ছ'টা ভৈরবীচক্রে রাতে ঘুরতুম। তখন দক্ষিণেশ্বরে, আলমবাজারে, অনেক ভৈরবীচক্রের আড্ডা ছিল। রাতে পাঁচ-ছ'টা চক্রে ঘুরলে, আর কি শরীর থাকে!" * * মুখুজ্যে তাহার পর অতি জঘন্য কথা বলিতে লাগিলেন, এত জঘন্য যে, তাহা শুনিয়া আমাদের ভিতর একটু ত্রাস আসিতে লাগিল। আমরা উভয়ে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। কথা থামাইবার জন্য রাখাল মহারাজ বলিলেন, "মুখুজ্যে, তোমার ছেলে বসে আছে, কি করছো?" * * মুখুজ্যে ছেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এ সব বাপের কথা—মহাভারতের কথা, শুনতে কোনো দোষ নেই।"

শিমলা এবং কাঁসারীপাড়াতেও এইরূপ ভৈরবীচক্রের আড্ডা ছিল। আমরা ছেলেবেলায় এই সকল ভৈরবীচক্রের লোক-দিগের চালের ধামা উল্টাইয়া দিয়াছি এবং অনেক মারপিটও করিয়াছি। আমরা নূতন কলিকাতার এক প্রকার প্রথম পর্যায়; এইজন্য, পুরানো হীন আচার-পদ্ধতিসমূহ এত ঘৃণা করিতাম ও ভৈরবীচক্রের লোকদিগকে মারপিট করিতাম। এইরূপ মার দেওয়াতে, ভৈরবীচক্রের দল প্রকাশ্যে কিছু কমিয়াছিল। বোষ্টমী নাম দিলে লোকে বিশেষ আপত্তি করিবে না, এইজন্য, পরে, এই ভৈরবীচক্রগুলি নাম পরিবর্তন

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

করিয়া 'শচীমা-ভজা' দল বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিত। এই সব আখড়াগুলিতে অতি বীভৎস কার্য হইত।

মাতালের কথা তো বলিবারই নয়। সেই সময় শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ভিতর মদ খাওয়ার প্রথাটা খুব চলিয়াছিল। শিমলা ছিল 'অষ্ট-বসুর পাড়া',[১] অর্থাৎ, বিখ্যাত মাতালের পাড়া। রাখাল[২] ও আমরা সকলে, শনিবার সন্ধ্যার সময় লাঠি-সোঁটা লইয়া তৈয়ার হইতাম, তাহার পর, মাতালদের ঠেঙ্গানো শুরু হইত। রাস্তার দু-ধারে তখন পগার বা নরদমা ছিল। দু-একটি ধাঙড়ে উহা পরিষ্কার করিত। সেই পগারের ভিতর মাতালদের শুইয়া থাকিবার জায়গা ছিল। রবিবার দিন মাতালেরা রাস্তার ধারের এই পগারে, পাঁকের ভিতর, মাথায় ধাঙড়দের ঝোড়া দিয়া বালিশ করিয়া শুইয়া থাকিত; সোমবার সকালে যে-যার কাজে যাইত। তখন প্রচলিত কথাই ছিল ঃ

"হায় রে মজা শনিবার
বড় মজার রবিবার!"

পাঁকে শুইয়া থাকিবার সময় যদি পাহারাওলা আসিত, তাহা হইলে ঐ ভদ্রলোক মাতালেরা বলিত, "বাবা, এ police jurisdiction নয় যে ধরবে, এ municipal

১ শিমলা অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত বসু মহাশয়গণ বাস করিতেন। বসু মহাশয়গণের আটজন একত্র নেশা করিতেন। একটি মাটির গামলাতে মদ ঢালিয়া, উহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া, এই আটজন বন্ধু মুখে খাগড়ার নল দিয়া মদ টানিয়া পান করিতেন। মদের গামলাতে একটি গোলাপ ফুল দেওয়া থাকিত। যিনি ফুলটিকে নিজ নলের মুখে সকলের পূর্বে টানিয়া আনিতে পারিতেন, তিনিই এই পানমণ্ডলীর অধিপতি বা চক্রেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।

২ শ্রীযুত রাখালচন্দ্র ঘোষ, পরবর্তীকালে, স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

jurisdiction."—অর্থাৎ, এ (পগারটা) পুলিসের এলাকা নয় যে ধরবে, এ মিউনিসিপাল এলাকা।

কাদামাটির কথা কিছু জানা আবশ্যক। দুর্গাপূজার নবমীর দিন, পাঁঠা বা মহিষ বলি দিয়া, তাহার মুণ্ডটি কাদা মাখাইয়া মাথায় করিয়া লইয়া, সকলে রাস্তায় বাহির হইত; আর বৃদ্ধ পিতামহ তাঁহার পৈতৃক খাতাখানি লইয়া অশ্লীল গান শুরু করিতেন, এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি সকলে সমস্বরে সেই গান গাহিতে থাকিত। এখন সে সকল কুৎসিত বিষয় স্মরণ করিলে গা শিহরিয়া উঠে! কিন্তু ইহাই ছিল তখনকার সমাজের প্রথা।

তাহার পর হইল, পাঁচালি ও তরজার গান। সে সকল গান অতি কদর্য ও অশ্লীল। কিন্তু, তখনকার লোকেরা হাসি-মুখে, আনন্দ করিয়া, সেই সকল গান শুনিত। এখন সে সকল গান গাহিলে, সম্ভবতঃ, পুলিসে ধরিবে। কলিকাতার সমাজের তখন এত দূর অবনতি হইয়াছিল।

লোক মরিলে, কেহ তাহাকে দাহ করিতে যাইত না; এমন কি, যে বিবাহ করে নাই, সেও বলিয়া বসিত যে, তাহার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, সেইজন্য সে মড়া ছুঁইবে না ও দাহ করিতে যাইতে পারিবে না। বাড়ির পাশে লোক মরিলে, মড়া উঠিত না। এমন কি, জ্ঞাতি মরিলেও সহজে কেহ সঙ্গে যাইত না। যাহাকে সেবা ও শুশ্রূষার ভাব বলে, সে সব কিছুই ছিল না। কোনো রকমে নিজের জাত বাঁচাইলেই হইল! এ সব কথা সত্য, আমি স্বচক্ষে এ সব দেখিয়াছি।

সর্ব বিষয়ে প্রবঞ্চনা করা, মিথ্যা ব্যবহার করা, জালিয়াতি করা, বিধবাকে ঠকানো, প্রভৃতি ছিল বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। লোকের বিষয়-সম্পত্তি জাল করিয়া লওয়া, ঠকাইয়া লওয়া—এই সব ছিল বাহাদুরির কার্য। ইহা ব্যতীত, লোকে যে

আরো কত গর্হিত কার্য করিত, তাহা বলিবার নয়। সকল কথা এ স্থলে বলাও উচিত নয়।

মেয়েদের আট বৎসর হইতে নয় বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইত। ছেলেদেরও বিবাহ হওয়া চাই-ই। ষোল-সতরো বৎসরের ছেলে বিবাহ না করিলে জাত যাইবে, এমন কি যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে! আমার নিজের বেলায় ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। আমি যখন সতরো বৎসরে বিবাহ করিলাম না, তখন পাড়ায় এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ভদ্রলোকেরা তো সেজন্য নিন্দা করিলেনই, এমন কি, আমাদের বুড়ী কাদীহাড়িনী, যে আমাদের বাড়ির ময়লা পরিষ্কার করিত, সেও আসিয়া আমাকে ভৎ´সনা করিয়া গেল। এখন কিন্তু শহরে হাজার হাজার ছেলে বিবাহ করিতেছে না। আর, এখন মেয়েরাও অবিবাহিত থাকে। এখন মেয়েদের রাস্তায় বাহির হওয়া গা-সহা হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা তখন পালকি করিয়া রাস্তায় বাহির হইত; পালকির মাথায় ঘেরাটোপ দেওয়া থাকিত। গঙ্গাস্নান করিবার সময় বেহারারা পালকিখানি গঙ্গার জলের উপর ধরিত এবং পালকির নীচুকার বেতের ছাউনির ভিতর দিয়া জল ঢুকিলে, মেয়েরা ভিতরে বসিয়া স্নান করিত।

বংশ ও জাত বিষয়ে অতি কঠোর নিয়ম ছিল। নিমন্ত্রণ ও আহার বিষয়েও ঘোর সমস্যা ছিল। নিমন্ত্রণ করিতে যাইলে, প্রথমে সাত পুরুষের পরিচয় দিতে হইত, তাহার পর, কে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে, সে নিমন্ত্রণ করিবার উপযুক্ত কি-না, তাহার মারফৎ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাইতে পারে কি-না, এবং যে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়াছে, তাহার বাড়িতে খাওয়া যাইতে পারে কি-না—এই সব বিষয় লইয়া মহা গণ্ডগোল হইত। আমি ছেলেবেলায় নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া

বৃদ্ধদের হাতে পড়িয়া ক-এক বার এইরূপ বিপন্ন হইয়াছিলাম; শেষে, রাগিয়া চলিয়া আসি।

ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ কখনো ভাগবতের কথা শুনিতে যাইতেন না; ইহাতে তাঁহার মানহানি হইত। ভাগবত গ্রন্থ তখন হাতে-লেখা পুঁথি ছিল। এমন কি, পুঁথির একখানি পাতা যদি দৈবাৎ খুলিয়া পড়িয়া যাইত তো, ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ চিমটা দিয়া ধরিয়া পাতাটা তুলিয়া রাখিতেন এবং ভাগবতের পাতা ছুঁইয়াছেন বলিয়া, হাত ধুইয়া, ইষ্টনাম্ জপ করিতেন। গোসাঁই-এর সহিত কোনো ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিতেন না; কোনো শ্রাদ্ধবাড়িতে গোসাঁই-এর সহিত এক-আসনে বসিতেন না। আবার, গোঁড়া বৈষ্ণবেরা দুর্গাঠাকুরকে বলিতেন, 'হাতীমুখোর মা'; বেলপাতাকে বলিতেন, 'তেফর্‌কা পাতা'; কালীঠাকুরকে বলিতেন, 'মসী'। এইরূপ গোঁড়ামির অনেক পুরানো গল্প আছে।

অনেক সময় লোকেরা তখন ইংরেজী ও বাংলা মিশাইয়া কথা বলিত। বাংলায় চিঠি লেখা অতি অসভ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইত। 'সধবার একাদশী'-তে নিমচাঁদ তাই বলিতেছেঃ "I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English..." আর এক স্থানে নিমচাঁদ বলিতেছেঃ "তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাঠুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গলার মিল্‌টন।"

প্রণাম করা ছিল কু-সংস্কারের বিষয়। কেহ বা ইংরেজীতে 'গুড মর্নিং' বলিয়া কার্য সমাধা করিত, কেহ বা বিশেষ ভদ্রতা অনুযায়ী ডান হাতের তর্জনীটি এক বার কপালে তুলিত, ইহাই ছিল তখনকার সভ্যতার পরিচয়। শ্রাদ্ধাদি

করা হইল কু-সংস্কারের কার্য, ইহার কোন দরকার নাই। দেবদেবীর পূজা করাও যেন অতীব গর্হিত কার্য! ঠাকুর-দেবতার কথা শুনাও ছিল কু-সংস্কার! কালীপূজার সহিত ভৈরবীচক্রের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এইজন্য, কালীঠাকুর অনেকের কাছে বিশেষ করিয়া বর্জনীয় ছিল। আর, সরস্বতী ও কার্তিক পূজা ছিল বেশ্যা পল্লীর পূজা; ভদ্রলোকদিগের এই সকল পূজা করা ছিল অবিধেয়।

ধর্ম-উপদেষ্টা নামে, কথক ঠাকুর ও গাইন ঠাকুর কথকতা ও পালাগান করিত। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা তাহাদের কথকতা ও পালাগান শুনিতে যাইতেন; অন্যান্য ভদ্রলোকরা কখনো যাইতেন না। কথাবার্তার প্রচলিত মাত্রাই ছিল—'এ যেন কথকের কথা', অর্থাৎ, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ধর্মগ্রন্থ যাহা-কিছু ছিল এবং ধর্ম সম্বন্ধে যাহা-কিছু শুনিতে পাইতাম, তাহা হইল—যীশুখ্রীষ্টের গল্পবিষয়ক। পাদরীরা, এই সুযোগে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ও বাজারে যাইয়া সকলকে যীশুর গল্প শুনাইত। বাঙালী পাদরীরা, হেদোর[১] ধারে, কেষ্ট বন্দ্যোর[২] গির্জার কোণটিতে, রবিবার সকালে যীশুখ্রীষ্টের কথা বলিত, আর হিন্দু-দেবদেবীদিগকে গাল পাড়িত। দাদা[৩] একদিন বেলা নয়টার সময় ঐখান দিয়া আসিতেছিল। সে খানিকক্ষণ পাদরীদের বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া ঝগড়া শুরু করিল। ঝগড়াটা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। দুই দিকে বেশ দল পাকিল; এমন কি, মারামারি হইবার উপক্রম হইল। পরে, দুই দল

১ কর্নওআলিস স্কোয়ার (বর্তমান নাম—আজাদ হিন্দ্ বাগ)

২ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্তীকালে, স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাণ্ডা হইলে, দাদা চলিয়া আসিল এবং দুই দলের লোকেরাও রাগিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে খ্রীষ্টান পাদরীরা সকলকে খ্রীষ্টান করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিল। ইংরেজ পাদরী ও সহকারী দেশীয় পাদরীর সংখ্যা খুব অধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা গলির মোড়ে মোড়ে, বাজারে ও নানা স্থানে যাইয়া হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-সমাজের কুৎসা ও অসারতা প্রচার করিতে লাগিল। পাদরীরা বলিত যে, গঙ্গাস্নান করা কু-সংস্কার; তেল মাখিয়া স্নান করা কু-সংস্কার; দাড়ি কামানো কু-সংস্কার। —এইজন্য, আমরা দাড়ি কামাইতাম না।—তাহারা বলিত, হিন্দুদের যাহা-কিছু আছে, তাহাই কু-সংস্কার; শুধু তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। হিন্দু-ধর্ম মানেই হইল, কু-সংস্কার; হিন্দু-ধর্ম মানেই হইল, যাহা-কিছু সব ভুল।

হিন্দু-ধর্ম যে কি, তাহা অনেকেই তখন বুঝিত না। হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে কাহারো বিশেষ কিছু পড়া-শুনা ছিল না, এবং হিন্দু-ধর্মের বিষয় কোনো গ্রন্থও তখন পাওয়া যাইত না। এইজন্য, পাদরীদের কথার উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য ছিল। আবার, পাদরীরা ছিল ইংরেজ। পাদরীদের কিছু বলিলে, পাছে হাঙ্গামা হয়, সেইজন্য সাহস করিয়া কেহ বিশেষ কিছু বলিতে পারিত না। নরেন্দ্রনাথ যে সাহস করিয়া হেদোর ধারে পাদরীদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল, সেরূপ সকলে পারিত না। য়ুরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একটি উক্তি আছে: First send the missionaries, then send the merchants and last send the army. ইহার অর্থ এই যে, একটি দেশ জয় করিতে হইলে, প্রথমে ধর্ম-প্রচারকদিগকে পাঠাইবে, পরে বণিক্‌দিগকে এবং সর্বশেষে সৈন্যদলকে পাঠাইবে। ভারতবর্ষেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।

এইজন্য, পাদরীদিগকে আমরা সশঙ্কচিত্তে দেখিতাম; শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা নয়, অতিশয় ভয় করিতাম; কারণ, ভাবিতাম, তাহারা কখন্ কি বিপত্তি আনিয়া দিবে! গ্রাম্য ভাষায় তখন একটি কথা প্রচলিত ছিল:

"জাত মাল্লে পাদরী এসে,
প্যাট্ মাল্লে নীল বাঁদরে।"

অর্থাৎ, পাদরীরা আসিয়া জাত ও ধর্ম নষ্ট করিল, এবং নীলকরেরা উদরের অন্ন হরণ করিল।

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব-ধর্মের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু জানিতাম না। গীতা ও উপনিষদের নাম কেহ শুনে নাই। চণ্ডীপাঠ মাত্র ক-একজন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ করিতেন। ত্রৈলোক্য সান্যাল মশাই[১] শ্রীচৈতন্যের বিষয় একটি গ্রন্থ[২] লিখিয়াছিলেন। আমরা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে প্রথম এই গ্রন্থ পাঠ করি। 'চৈতন্য-চরিতামৃত'[৩] নামে যে কোনো গ্রন্থ আছে, এ বিষয় আমরা তখন কিছুই জানিতাম না। পাদরীরা বাইবেলগুলি বাড়ি বাড়ি দিয়া যাইত, সেইটাই আমাদের কতকটা পড়া ছিল মাত্র।

আবার, এক মত উঠিল কোঁতিস্ট্‌দের। ইহাদের মত হইল যে, ঈশ্বরাদি কিছুই নাই। ইহাদের প্রত্যক্ষবাদী—Positivist বলা হইত। ব্রাহ্ম-ধর্ম তবু একটা ধর্মের ভিতর ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষবাদীরা সব উড়াইয়া দিত।

কলিকাতার যখন এইরূপ অবস্থা, তখন কেশববাবু[৪] বক্তৃতা

১ শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। চিরঞ্জীব শর্মা ও প্রেমদাস নামেও ইনি পরিচিত
২ ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা
৩ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত
৪ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

দিতে লাগিলেন। কেশববাবুর বিষয় কিছু বলিতে হইলে, ইহা প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, তাঁহার চেহারা ও মুখশ্রী, কার্যকারিতা বা সফলতা লাভে তাঁহাকে বারো আনা ভাগ সাহায্য করিত, এবং বাকি চার আনা ভাগ সাহায্য করিত তাঁহার বাক্যবিন্যাস। আলেখ্যে[১] তাঁহার যে মূর্তি দেখা যায়, তাহা শুধু এক ভাব হইতে দেখানো হইয়াছে, কিন্তু কেশববাবুর জীবিত অবস্থার চেহারা আরো সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ ছিল। চোখের চাহনি ও মুখভঙ্গী—ভক্তি, ঈশ্বরবিশ্বাস ও ওজস্বিতার ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। কেশববাবুকে দেখিয়াছেন এমন কোনো লোক যদি আজও জীবিত থাকেন তো, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, কেশববাবুর চেহারাতে একটি বিশেষ লাবণ্য বা মাধুর্য ছিল, এবং সাধারণ লোক হইতে তাঁহার চেহারার অনেক অংশে প্রভেদ ছিল।

পাদরীরা যেমন পাড়ায় পাড়ায় গিয়া বক্তৃতা দিত, কেশববাবুও তেমনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়া, মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া, হিন্দু-ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কেশববাবু প্রথম অবস্থায় ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু কিছু দিন পর হইতে বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করিলেন। আমরা কেশববাবুর নিকট প্রথম বাংলায় বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম; তাহা নিন্দনীয় নয়। শিমলাতে মনোমোহনদার[২] বাড়ি এবং নন্দ চৌধুরীর বাড়িতে এক সময়ে তিনি সভা করিয়াছিলেন। সমস্ত দেশটা যাহাতে খ্রীষ্টান না হইয়া যায়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের মাঝামাঝি একটি সেতু তৈয়ার

১ কলিকাতার অ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউট-এ রক্ষিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৈলচিত্রে

২ শ্রীযুত মনোমোহন মিত্র, শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের মাসতুতো ভাই

করিতে চেষ্টা করিলেন। যীশুকে তিনি Oriental Christ —প্রাচ্যদেশীয় যীশু ও তপস্বী যীশু করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। তিনি কতকগুলি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাগুলিতে তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, বিলাতী হ্যাট-কোট ত্যাগ করাইয়া দেশী যীশু করো এবং যীশুবিহীন যীশুর ধর্ম মানো। কেশববাবু হিন্দু-ধর্মের বিগ্রহপূজাদি ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ভক্তির পথ অবলম্বন করিলেন। ইহাতে শিক্ষিত লোকের ভিতর খ্রীষ্টান-হওয়া কিছু পরিমাণে কমিয়াছিল। ব্রাহ্ম-ধর্মে কিছু পরিমাণ খ্রীষ্ট-ধর্ম ও কিছু পরিমাণ হিন্দু-ধর্মের আচার-পদ্ধতি মিশানো ছিল। কেশববাবু তাঁহার ব্রাহ্ম মত প্রচার করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই তখন প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, কেশববাবুর দলে যাইতে লাগিলেন। আমরাও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাঁহার অনুগত হইলাম। কেশববাবুর দলে যোগদান করায়, যদিও মদখাওয়া ও অন্যান্য সামাজিক দুর্নীতি হইতে আমরা অন্য দিকে যাইলাম; কিন্তু এক দিকে, নিরাকার ব্রহ্ম যে কি, তাহা কিছুই বুঝিতাম না, এবং অপর দিকে, ঠাকুর-দেবতা ও পুরানো আচার-পদ্ধতিও কিছু মানিতাম না।

সমাজের এইরূপ অবস্থাতে আমাদের শৈশবকাল কাটিয়াছিল। সমাজে তখন নাস্তিকতা ও বিশৃঙ্খলতার ভাব আসিয়াছিল। অনেক শিক্ষিত যুবক এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় থাকিয়া, শেষে খ্রীষ্টান হইয়াছিল। কিন্তু আমরা অধিকাংশ যুবক খ্রীষ্ট-ধর্ম পছন্দ করিতাম না ও হিন্দু-ধর্মও মানিতাম না। আমরা পুরানো কিছু মানিতাম না; নূতন যে কি করিতে হইবে, তাহাও জানিতাম না। আমরা কোন্‌টা যে ধরিব, তাহা তখন স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। মহা অশান্তির ভাব আসিল। যুবকদের মনে প্রচণ্ড আগুন জ্বলিল। কি

করিতে হইবে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না। পুরানো বাংলা তখন চলিয়া যাইতেছিল এবং নূতন বাংলা আসিতেছিল।

কেশববাবু বাংলাদেশে প্রথম নব ভাব জাগ্রত করিলেন। তিনি 'ব্যাণ্ড অভ্ হোপ' (Band of Hope) নামে একটি দল গঠন করিলেন। দলের লোকেরা মদ খাইবে না; এমন কি, তামাকও খাইবে না। নরেন্দ্রনাথ এই ব্যাণ্ড অভ্ হোপ বা 'আশার দল'-এ নাম লিখাইয়াছিল। তবে, এই দলের ভিতর কলিকাতার যুবক তত বেশী ছিল না; পূর্ববঙ্গের অনেক লোক ছিল।

এক দিন নরেন্দ্রনাথ তামাক খাইতেছে, এমন সময়, প্রিয় মল্লিক নামে কেশববাবুর সমাজভুক্ত জনৈক যুবক আসিয়া বলিল, "নরেন, তুমি কি করলে, তামাক খেলে?" —তামাক খাওয়াটা যেন একটা মহা গর্হিত কাজ! নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "আরে, ব্যাণ্ড অভ্ হোপ-এর দলে থাকলেও তামাক খেতে দোষ নেই।" এই বলিয়া কথাটি ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিল।

এক দিকে যেমন মাতালের দল উঠিল, অপর দিকে তেমনি এই ব্যাণ্ড অভ্ হোপ-এর দল উঠিল। ব্যাণ্ড অভ্ হোপ-এর দলের কথা ছিলঃ Touch not, taste not, smell not, drink not anything that intoxicates the brain.—অর্থাৎ, যাহাতে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, এমন কোনো জিনিস স্পর্শ, আস্বাদন, আঘ্রাণ বা পান করিও না। এইরূপ দুই দলে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল।

কেশববাবু 'নব-বৃন্দাবন'[১] নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি, সম্ভবতঃ মুদ্রিত হয় নাই; কারণ, বাজারে

১ নাটকটির প্রকৃত রচয়িতা শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

আমরা কখনো উহা দেখি নাই। এই নব-বৃন্দাবন অভিনয়ে, নরেন্দ্রনাথ ক-এক বার পাহাড়ীবাবার অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথকে এক ব্যক্তি এক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "নরেন, পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় কি করতে হয়?" নরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "চুপ করে বসে কেবল ধ্যান করতে হয়।"

যাহা হউক, নব-বৃন্দাবন অভিনয় ক-এক বৎসর বেশ একটা হুজুক আনিয়াছিল; তবে, এই অভিনয় কেশববাবুর সমাজভুক্তদিগের মধ্যে হইত, বাহিরে হইত না।

বিদ্যাসাগর মশাই[১] বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিলেন। কেশব-ব্রাহ্মবাবু বিবাহ-বিধি অনুযায়ী অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলন করিবার চেষ্টা করিলেন। কেশববাবু বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয়ও স্থাপন করিলেন; কারণ, এই সময় পাদরীরা দু-একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। সাধারণতঃ, স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা-ঘেরা ও টোপ-ঢাকা হইয়া বাহির হইত। সেই ভাবটা কেশববাবু দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেশববাবু স্ত্রীলোকদিগকে সমাজে[২] বসিতে দিতেন, অর্থাৎ, স্ত্রীলোকদিগের বাড়ির বাহির হওয়া সমর্থন করিতেন। কেশববাবু তখনকার সমাজের নানা প্রকার সংস্কার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁহার সংস্কার-প্রথা তত ফলদায়ক হয় নাই, কারণ, সমাজ তখন একেবারে পচিয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় কেশববাবুর বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। তিনি ভাগবতের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন। সাধু অঘোরনাথ কেশববাবুর এক তাপস সহকারী ছিলেন। তিনি ক-এক বৎসর আমাদের সাত নম্বর রামতনু বসু গলির

১ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২ নব-বিধান-সমাজে

বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এইজন্য, তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম; তিনি যথার্থই একজন তাপস ছিলেন। প্রতাপ মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রভৃতি সকলে প্রথম অবস্থায় কেশববাবুর সংস্পর্শে আসিয়া নব ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে, শাস্ত্রী মশাই, গোসাঁইজী, উমেশ দত্ত, নগেন চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি সকলে পৃথক্ হইয়া 'সাধারণ-সমাজ' স্থাপন করেন; কিন্তু তাহা হইলেও, কেশববাবুর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্বের ন্যায় অটল ছিল। আমরা সকলেও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতাম।

সাধারণ-সমাজ গঠিত হইলে পর, আমরা সাধারণ-সমাজে যাইতে লাগিলাম। সেখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন চট্টোপাধ্যায়, উমেশ দত্ত, প্রভৃতি ক-এক জনের বক্তৃতা শুনিতাম। এইরূপে, ক্রমে যুবকদিগের ভিতর ব্রাহ্ম-ধর্মের ভাব জাগিয়া উঠিল। পরে যাঁহারা পরমহংস মশাই-এর[১] কাছে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রথমে সাধারণ-সমাজে যাতায়াত করিতেন।

যুবা শরৎ[২] বিগ্রহপূজা বা মূর্তিপূজার বিশেষ বিরোধী ছিল। কারণ, তখন সে সাধারণ-সমাজে যাতায়াত করিত। বরানগর মঠে, এক দিন বিকালবেলা, আমার সঙ্গে তাহার এ বিষয়ে অনেক কথা হইয়াছিল।

বেলুড় মঠে, এক দিন সারদানন্দ আমায় বলিলেন, "আচ্ছা, মনে আছে তোমার, গোস্বামী মশাই করুণ স্বরে বলতেন—

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহধারণকালে তাঁহাকে সকলে 'পরমহংস মশাই' বলিতেন

২ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, উত্তরকালে, স্বামী সারদানন্দ

হে শ্রীহরি, হে শ্রীহরি, হে শ্রীহরি" ? —গোস্বামী মশাই তিন বার তিন প্রকার কণ্ঠস্বর করিয়া অতি কাতর ও করুণ-ভাবে বলিতেন, "হে শ্রীহরি, হে শ্রীহরি, হে শ্রীহরি !" সে বাণী শুনিলে হৃদয় জুড়াইত। সে কণ্ঠস্বর, সে শব্দ, সে বাণী এখনো প্রাণে লাগিয়া রহিয়াছে। আর কাহারো এমন কাতর ও করুণ কণ্ঠস্বর শুনি নাই।

তারকনাথও[১] বিশেষরূপে ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারকনাথ নিজ মনে সর্বদাই ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাহিতে ভালবাসিত।

নরেন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গান ভাল করিয়া শিখিলে পর, সাধারণ-সমাজের উপাসনার দিন, রাত্রে, মাঝে মাঝে, ধ্রুপদ গান গাহিত। ব্রহ্ম-সঙ্গীতেও সে অল্প বয়সে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সাধারণ-সমাজের কর্তৃপক্ষের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই এক এক দিন সকালে আমাদের গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ির দরজায় আসিয়া আমায় ডাকিয়া বলিতেন,—তোমার দাদা, নরেনকে, এই সব কথা বলো, ওখানে যেতে বলো, ইত্যাদি। তিনি ক-এক বার আসিয়া আমাকে এইরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন স্মরণ আছে।

এই সময়, নরেন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ না পাওয়ায়, হার্বার্ট স্পেনসার ও স্টুআর্ট মিল-এর গ্রন্থসমূহ অত্যধিক পাঠ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, স্পেনসার ও মিল-এর গ্রন্থ পাঠ করিয়া, সকলের সহিত খুব তর্ক করিত। এমন কি, পাদরীদিগের সহিত সমানভাবে তর্ক করিত। Dare-devilry—ডানপিটেমি করা ছিল শিমলার ছেলেদের বিশেষ spirit বা ধাত। তাহারা কাহাকেও ভয়-ডর করিত না,

১ শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষাল, উত্তরকালে, স্বামী শিবানন্দ

কাহারো খাতির রাখিত না, তেড়েফুঁড়ে মুখের উপর কথা বলিত।

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস

দক্ষিণেশ্বরে যে, 'পরমহংস' নামে একজন লোক আছেন, তিনি যে খুব উচ্চ অবস্থার লোক, অতি সাধু ও অমায়িক—যাহাকে বলে, 'বালক-স্বভাব', এই প্রকৃতির লোক—এ কথা কেশববাবুর বক্তৃতা হইতে লোকে জানিতে পারিল। কেশববাবু বলিলেন যে, এই পরমহংসের 'ট্রান্স' (Trance) হয়; যীশুরও এইরূপ ট্রান্স হইত। ট্রান্স কি এক নূতন শব্দ, আমরা তাহার কিছু মানে জানিতাম না। সাধারণ লোকের ধারণা হইল যে, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস নামে কে-একজন লোক থাকে, তাহার মিরগি হয়, কিন্তু হাত-পা খেঁচাখেঁচি করে না, আপনা-আপনি ভাল হয়, ডাক্তার দেখাইতে হয় না। সাধারণ লোকে ট্রান্স বলিতে এইরূপ বুঝিত। আবার শুনা গেল যে, সে লোকটি রাসমণিদের[১] পূজরী; কালীপূজা করিয়া থাকে। লোকটার নাম আবার 'পরমহংস',—এ আবার কি কথা! লোকেরা অমনি হাসি ও ব্যঙ্গচ্ছলে পরমহংস-কে 'গ্রেট গুস' (Great goose) বলিতে লাগিল।

পরমহংস মশাই-এর প্রতি তখনকার লোকের প্রথমে এইরূপ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। আমরা তখন তাঁহাকে দেখি নাই, আর, দেখিতে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না!—কোথায়, কে-একজন লোক আছে, তার মিরগি ব্যামো হয়, কি আর দেখবো! কেশববাবু বলিয়াছেন, লোকটি ভাল; এইজন্য তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ জানিতে

১ রাণী রাসমণি

আগ্রহ ছিল মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের বিষয় এর বেশী কিছু আমাদের জানা ছিল না, এবং অন্য লোকেরাও জানিত না।

বোধ হয়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রামদাদার বাড়িতে কলেরা হয়। তাহাতে, রামদাদার প্রথম মেয়েটি এবং দুইটি ভাগ্নী, সাত দিনের ভিতর মারা যায়। রামদাদা সেই সময় বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কোনো জায়গায় শান্তি পাইলেন না। অবশেষে, তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের নিকট যাইলেন। কেশববাবুর নিকট হইতে শুনিয়া পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে যাতায়াত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া তাঁহার নিকট যাওয়া, এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা, এই হইল প্রথম। পরমহংস মশাই-এর সহিত রামদাদার কি কথাবার্তা হইয়াছিল, সে সব বিষয় আমার কিছু জানা নাই। তবে, রামদাদা, পরমহংস মশাই-এর কাছে যাইয়া, অনেকটা শান্তি পাইলেন এবং স্থির-ধীর হইয়া কার্য করিতে লাগিলেন। মোট কথা, এই হইল আমাদের শিমলার লোকের পরমহংস মশাই-এর সহিত প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

রামদাদা ডাক্তারি করিতেন। এইজন্য, তাঁহাকে লোকে 'রামডাক্তার' বলিয়া ডাকিত। রামদাদা কিছু দিন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিবার পর, শিমলায় খবর রটিল যে, রামডাক্তারের এক গুরু হইয়াছে, সে কৈবর্তদিগের পূজরী, দক্ষিণেশ্বরে থাকে। ইহাতে নানা প্রকার কথাবার্তা উঠিল; কারণ, রামদাদারা হইলেন বৈষ্ণববংশীয়। রামদাদার পিতামহ, কুঞ্জবিহারী দত্ত, গোসাঁই ছিলেন, এবং তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। রামদাদা নিজের কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না লইয়া, এক অজানা ব্যক্তির কাছে দীক্ষা লইয়াছেন, সে ব্যক্তি আবার কালীর উপাসক, শাক্ত। এইজন্য, অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, রামদাদা নিজের কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র না লইয়া, পরমহংস মশাইকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

রামদাদা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করায়, প্রথমে কিছু দিন সকলেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল: এ আবার কি ঢঙ হ'ল, পরমহংস-ই বা কি? রামদাদা কিন্তু রবিবারে অবসর পাইলেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সমবয়সী বন্ধু ও পাড়ার লোক, সুরেশ মিত্তিরকে[১] এই সকল কথা বলেন।

সুরেশ মিত্তির সওদাগরী অফিসের একজন বড় কর্মচারী ছিলেন। সুরেশ মিত্তিরদের বাড়ি আমাদের তিন নম্বর গৌর-মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বাড়ি-সংলগ্ন ছিল। আমাদের বাড়ির পিছনের পুকুরের পাড় দিয়া তাঁহাদের বাড়ির ভিতর যাতায়াত করা যাইত, তবে, তাঁহাদের বাড়ির সদর দরজা ভিন্ন রাস্তায় ছিল। এখন সে বাড়ি ভাঙিয়া রাস্তা হইয়াছে। সুরেশ মিত্তির শাক্ত ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি অতি দুর্ধর্ষ লোক ছিলেন। কেশববাবু যখন বিডন গার্ডেন-এ বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও খোল বাজাইয়া নামকীর্তন করিয়াছিলেন, তখন সুরেশ মিত্তির ছুরি দিয়া খোলের চামড়া কাটিয়া দিয়াছিলেন।

রামদাদা সুরেশ মিত্তিরকে পরমহংস মশাই-এর কথা বলিলে, তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন, "ওহে রাম, তোমার গুরু, পরমহংস, যদি আমার কথার উত্তর দিতে পারে, তবে ভাল, নইলে তার কান মলে দিয়ে আসবো।" সুরেশ মিত্তির কান মলিয়া দিবেন, এই শর্তে, দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন; কিন্তু, পরমহংস মশাই-এর সহিত খানিকক্ষণ কথাবার্তা কহিবার পর

১ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ইঁহার নাম, পাড়ার লোকে 'সুরেশ মিত্তির' বলিয়া ডাকিতেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ইঁহাকে আদর করিয়া 'সুরেশ' বলিয়া ডাকিতেন।

তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাহার পর হইতে তিনি পরমহংস মশাই-এর অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন।

কৈলাসডাক্তারও[১] আমাকে এক বার বলিয়াছিলেন যে, রামদাদা যখন তাঁহাকে এক বার কাশীপুরের বাগানে যাইয়া পরমহংস মশাইকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "রাম, তোমার পরমহংস যদি ভাল লোক হয় তো ভাল, নইলে তার কান মলে দেবো।" এই কড়ারে, কৈলাসডাক্তার, রামদাদার সহিত কাশীপুরের বাগানে গিয়া, নীচে, পুকুরের ধারে চাতালে বসিয়া থাকেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আরে, প্রথমে গিয়ে দেখলুম যে, নরেনটা বি. এ. পাশ করে একেবারে বখে গেছে, নীচেকার হল-ঘরে কতকগুলো ছোঁড়া নিয়ে এলোমেলো ভাবে বসে আছে, আর, রামের বাড়ির সেই চাকর ছোঁড়া, লাটু[২], সেটাও কাছে বসে আছে, আরে ছ্যা!" —তিনি বলিতে লাগিলেন, "পরমহংস মশাই-এর শরীর অসুস্থ ছিল, সেইজন্য লোক মারফৎ বলে পাঠালেন যে, যে বাবুটি আমার কান মলে দেবেন বলেছেন, তাঁকে ওপরে নিয়ে এস। যে লোকটি ডাকতে এসেছিল, সে তো অবাক্ হয়ে খুঁজতে লাগলো, আর, কিছু ইতস্ততঃ করে ঐ কথাগুলি বলতে লাগলো।"

এই শুনিয়া, অপ্রতিভ হইয়া, কৈলাসডাক্তার অবশেষে সসম্ভ্রমে উপরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "শিমলাতে ঘরের ভেতর বসে রামের সঙ্গে পরমহংসের বিষয় যে কথা হয়েছিল, কাশীপুরের বাগানে সে সংবাদ এখনি কি করে এল!" তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া উপরে যাইয়া

১ ডাক্তার সার্ কৈলাসচন্দ্র বসু

২ শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের যুবক-ভৃত্য; উত্তরকালে, স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

পরমহংস মশাই-এর পায়ের কাছে প্রণাম করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অজান্তে কি ভুল কাজই না করিয়াছিলেন! সেই অবধি কৈলাসডাক্তার পরমহংস মশাইকে গুরু বলিয়া মানিতেন এবং তাঁহার প্রতিকৃতি প্রণাম না করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইতেন না।

নরেন্দ্রনাথ ছিল শিমলার এক দুষ্টু ছেলে। বয়স অল্প হইলেও, সে খুব ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিল। সাধারণ-সমাজ কেশব-বাবুর সমাজ, প্রভৃতি অনেক জায়গায় সে যাতায়াত করিত। পাড়ায় তাহার একটা বেশ নাম ছিল। সে ছিল পাড়ার ছেলেদের চাঁই বা সর্দার। পাড়ার সব ছেলে তাহার অনুগত ছিল। নরেন্দ্রনাথের পাড়ার ডাক-নাম ছিল 'বিলে'। কাশীর ৺বীরেশ্বরের পূজা করিয়া তাহার জন্ম হওয়ায়, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল 'বীরেশ্বর'—ক্রমে, সংক্ষেপে তাহা 'বিলে' হইয়া যাইল। রামদাদা এক দিন বলিলেন, "বিলে, তুই তো এদিক্-ওদিক্ ঘুরে বেড়াস, দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন, দেখতে যাবি? চল্।" নরেন্দ্রনাথ অমনি বলিল, "সেটা তো মুক্‌খু, কী সে পেয়েছে, যে তার কাছে তা শুনতে যাব? আমি স্পেনসার, মিল, হ্যামিলটন, জন্ লক, প্রভৃতির এত দর্শনশাস্ত্র পড়লুম, আমি কিছু বুঝি না, আর একটা আকাট মুক্‌খু, কালীর পূজরী, কৈবর্তদের বামুন—সেইটার কাছে শিখতে যাব? সেটা জানে কি? কী সে জেনেছে, যে আমাকে শেখাতে পারে?" রামদাদা তথাপি নরেন্দ্রনাথকে পরমহংস মশাই-এর কাছে যাইবার জন্য অনেক অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ বলিল, "যদি সে রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভাল, নইলে কান মলে দেবো, আকাট মুক্‌খুটাকে সিধে করে দেবো।"—তখনকার

দিনে 'কান মলে দেবো' বলাটাই যেন অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কথা বলিবার ধারা ছিল।

নরেন্দ্রনাথ পরে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাই-এর কাছে গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া পরমহংস মশাই জোড়হাত করিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। আর এক দিন নাকি, পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিতেই, সে অর্ধজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমায় কি করলে, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমার যে বাপ-মা আছে! আমি যে উকিল হবো!"—ইহা আমার শুনা কথা, আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, এইজন্য ঠিকভাবে বলিতে পারিতেছি না। আমি এ বিষয়ে স্বামী সারদানন্দের কাছে শুনিয়াছিলাম; রামদাদার কাছেও কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম।

পূর্বে, মাত্র রামদাদা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু এখন পাড়ার সুরেশ মিত্তির ও নরেন্দ্রনাথও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। রামদাদা এখন একটু জোর পাইলেন যে, পাড়ার কেহ আর বিদ্রূপ ও আপত্তি করিবে না। শিমলার সুরেশ মিত্তির ও নরেন্দ্রনাথ পরমহংস মশাই-এর অনুরক্ত হইলে, শিমলার লোকের মনের ভাব অনেক বদলাইল; কারণ, এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন শিমলার যুবকদের সর্দার। এইজন্য, রামদাদা এই ভাবিয়া মহা আনন্দিত হইলেন যে, তাঁহার কার্য সফল হইয়াছে।

রামদাদার বাড়িতে

রামদাদাদের পূর্বকার বাড়ি ছিল কলিকাতার পূর্ব প্রান্তে, নারিকেলডাঙ্গায়। এই বাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। রামদাদা

শিমলায় বাড়ি তৈয়ার করিয়াছিলেন। বাড়ির ঠিকানা ছিল—এগারো নম্বর মধু রায় লেন। এই লেন বা গলিটি ছোট; পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। এই বাড়িতেই পরমহংস মশাই সর্বদা আসিতেন। বাড়িটি গলির দক্ষিণ দিকে। বাড়িটির সদর দরজা ছিল উত্তরমুখো। দক্ষিণমুখো হইয়া সদর দরজায় ঢুকিতে, ডান দিক্ হইতে পশ্চিম দিকের দেওয়াল পর্যন্ত, বাহিরে একটি সরু ও লম্বা রক ছিল। দরজায় ঢুকিয়া, সম্মুখে, একটা পথ বা দালান বা একটা বড় ঘরের মাপের মতো জায়গা; এবং ডান ধারে, অর্থাৎ, পশ্চিম দিকে, তিনটি দরজাওয়ালা একটি বৈঠকখানা। এই ঘরটির উত্তর দিকে, অর্থাৎ, রাস্তার দিকে, লোহার গরাদেওয়ালা দুইটি জানালা; এবং দক্ষিণ দিকে, গরাদেওয়ালা অনুরূপ দুইটি জানালা ছিল। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মাঝখানে সার্শি-দেওয়া তাক; এবং তাহার দুই পাশে দুইটি খালি ফোকর, অর্থাৎ, তাহাতে তাক ছিল না। সদর দরজার সম্মুখের পথটি বা দালানটি দিয়া দক্ষিণ দিকে বা ভিতর দিকে যাইলে, ছোট একটি দালান। দালানটি হইল পূর্ব-পশ্চিমমুখো বা বরাবর। দালানের দক্ষিণ দিকে, ছোট একটুখানি উঠান। উঠানটির বাঁ-দিকে বা পূর্ব দিকে, দুইটি থামওয়ালা একটুখানি দালান; এবং ঠিক দক্ষিণ দিকে, একটি লম্বা ঘর। উঠানের ডান দিকে বা পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে, উপরে উঠিবার সিঁড়ি। সিঁড়িটিতে দক্ষিণমুখো হইয়া উঠিত হইত। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে বাঁ-দিকে বা মাঝের চাতালের দক্ষিণ দিকে একটি কুঠরি বা ছোট ঘর। এই ঘরটিতে শিবানন্দ স্বামী কিছু কাল তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহার পর, সিঁড়িটি ধরিয়া ঘুরিয়া গিয়া দোতলায় উত্তরমুখো হইয়া উঠিলে, প্রথমে, সম্মুখে একটি কল-ঘর; এবং পূর্ব দিকে মুখ করিলে, একটি

লম্বা দালান। দালানটির উত্তর দিকে, নীচুকার বৈঠকখানা ও সদর দরজার দালানের রুজু, দুইটি ঘর। বাড়ির উপরে, দোতলায়, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে, আরো দুইটি ঘর ছিল; এবং নীচুকার পূর্ব দিকের বর্ণিত ছোট দালানের উপরেও আর একটি ঘর ছিল। দোতলার সিঁড়িটি আবার ঘুরিয়া গিয়া তেতলার ছাদে উঠিয়াছে। এই হইল রামদাদার বাড়ির মোটামুটি বর্ণনা। ইহা হইল ১৮৮২ বা ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

বোধ হয়, এই বৎসরেরই গরমিকালে, বৈকালবেলায়, পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে আসিলেন। দিনটি শনিবার কি রবিবার হইবে। আমি সন্ধ্যার সময় যাইলাম। যাইয়া, বৈঠকখানার তৃতীয় দরজাটির সম্মুখে, অর্থাৎ, দক্ষিণ-দেওয়ালের নিকট যে দরজাটি, তাহার সম্মুখে বসিলাম। ঘরটিতে প্রায় পনরো হইতে বিশ জন লোক বসিয়াছিল, এবং বাহিরে দালানটিতেও প্রায় ততগুলি লোক ছিল। বোধ হয়, মোট লোকসংখ্যা চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, তখনকার দিনে প্রণাম করিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। এইজন্য, তখনকার রীতি অনুযায়ী প্রণাম না করিয়া, দরজার নিকটে চুপ করিয়া বসিলাম; কেহ প্রণাম করিত না, আমিও করিলাম না। দাদা পূর্বেই আসিয়াছিল। বৈঠকখানাতে তিনখানি তক্তাপোশ পাতা ছিল, তাহার উপর শতরঞ্জি ও জাজিম বিছানো, এবং ক-একটি তাকিয়া ছিল। তামাকের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না; কারণ, রামদাদার হাঁপানি ব্যামো থাকায় তামাকের ধোঁয়াতে হাঁপানি বাড়িত। ঘরটির কড়ি-কাঠ হইতে, কাঁচের বাটির মতো দেখিতে, দুইটি গ্যাসের বাতি জ্বলিতেছে। পরমহংস মশাই পশ্চিম দিকের আলমারির বা সার্শি-দেওয়া তাকের কাছে বসিয়া আছেন, পিছনে একটি

তাকিয়া। দেবেন মজুমদার মশাই[১] তৃতীয় দরজার মাঝখানটিতে বসিয়াছেন; তাঁহার পরনের কাপড়খানি বেশ ফরসা ও কোঁচানো; হাঁটুর উপর কাপড়খানি রাখিয়াছেন; আর কোঁচানো উড়ুনিখানিও দু-ভাঁজ করিয়া দুই হাঁটুর উপর রাখিয়াছেন; গায়ে পিরান নাই, গলায় পইতা। দেবেন মজুমদার মশাই বরাবর আমাদের বাড়িতে আসিতেন, এইজন্য বহুকাল হইতে তিনি আমাদের পরিচিত ছিলেন। পাড়ার বৃদ্ধ কালীপদ সরকার মশাই-ও ঘরে বসিয়াছিলেন। বাকি আর সকলে অন্য জায়গার লোক ছিলেন, তাঁহাদের চিনিতাম না। সুরেশ মিত্তির প্রণাম করিয়া অস্থির হইয়া পায়চারি করিতেছেন, যেন ভাবে ও আনন্দে স্থির হইয়া বসিবার সামর্থ্যও নাই। রামদাদা এদিক্-সেদিক্ করিতেছেন। গরমি-কাল; ঘরটির ভিতরে গরম ছিল, এইজন্য দাদা রাস্তার ধারের রকটিতে বসিল। রাখাল লাজুক ছিল, সে ঘরের ভিতর না ঢুকিয়া এদিক্-ওদিক্ কোথায় রহিল। রামদাদার মাসতুতো ভাই, মনোমোহনদাদা (রাখালের নিজ শ্যালক) ঘরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমার প্রথম এইরূপ মনে হইল—দক্ষিণেশ্বর থেকে এই যে লোকটি এসেছে, একেই কি বলে 'পরমহংস'? দেখিলাম, লোকটির চেহারাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চেহারা সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লোকের মতো; বর্ণ খুব কালো নয়, তবে, কলিকাতার সাধারণ লোকের বর্ণ হইতে কিছু মলিন। গালে একটু একটু দাড়ি আছে, কপচানো দাড়ি। চোখ দুটি ছোট—যাহাকে বলে, 'হাতি চোখ'। চোখের পাতা অনবরত মিট মিট করিতেছে, যেন অধিক পরিমাণে চোখ নড়িতেছে।

১ শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ঠোঁট দুটি পাতলা নয়। নীচুকার ঠোঁট একটু পুরু। ঠোঁট দুটির মধ্য হইতে, উপরকার দাঁতের সারির মাঝের ক-একটি দাঁত একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে। গায়ে জামা ছিল; তাহার আস্তিনটা কনুই ও কব্‌জির মাঝ বরাবর আসিয়াছে। খানিকক্ষণ পরে, জামা খুলিয়া পাশে রাখিয়া দিল এবং কোঁচার কাপড়টি লম্বা করিয়া বাঁ-কাঁধে দিল। ঘরটি বেশ গরম হইয়াছিল। একজন লোক বড় এড়ানী পাখা, অর্থাৎ, বড় পাখা লইয়া পিছন দিক্‌ হইতে বাতাস করিতে লাগিল। কথাবার্তার ভাষা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষার মতো নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা, এমন কি, কলিকাতা শহরের রুচি-বিগর্হিত। কথাগুলি একটু তোতলার মতো। রাঢ়দেশীয় লোকের মতো উচ্চারণ; ন-এর জায়গায় ল উচ্চারণ করিতেছে, যেমন, 'লরেনকে বললুম', ইত্যাদি। সম্মুখে একটি রঙিন বটুয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কি মসলা আছে; মাঝে মাঝে একটু মসলা লইয়া মুখে দিতেছে।

আমাদের বয়স তখন অল্প, এবং আমরা শিক্ষিত সমাজে পরিবর্ধিত; এইজন্য, ভাষা ও উচ্চারণ শুনিয়া পরমহংস মশাই-এর প্রতি মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আসিল—এই লোকটাকে রামদাদা কেন এত সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন? চুপ করিয়া বসিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে আবার ভাবিতে লাগিলাম—কেন রামদাদা এই লোকটাকে এত সম্মান করেন; দুর্ধর্ষ সুরেশ মিত্তির, এবং বুদ্ধিমান্‌ নরেন্দ্র-নাথই বা কেন ক-এক বার এর কাছে গেছেন? লোকটার কি ব্যাপার?—দেখিলাম, ঘরে অনেকে বসিয়া আছেন, কিন্তু দুই একটি বৃদ্ধ একটি বা দুইটি প্রশ্ন করিলেন মাত্র; আর কেহ কিছু কথা কহিলেন না। লোকটি আপনি কথা কহিতেছে ও মাঝে মাঝে শ্যামা-বিষয়ক গান গাহিতেছে;

কখনো বা বৈষ্ণবদিগের গানও গাহিতেছে। সকল লোক নীরব হইয়া রহিয়াছে। আর একটি বিষয় দেখিলাম যে, সাধারণতঃ, কথকতা শুনিতে যাইলে মনে অন্য এক প্রকার ভাবের উদয় হয়—একটু হাসি-কৌতুকের ভাব থাকে; সাধারণ-সমাজে যাইলে মনটা উস্‌খুস্ করে এবং একটু গান শুনিবার ইচ্ছা থাকে, বা, কখন্ চলিয়া আসিব—এই ভাবনা হয়; ঠিক মন বসে না, যেন আধা-বৈঠকখানা ও আধা-ঠাকুরবাড়ির ভাব। কিন্তু, এখানে প্রথম দেখিলাম যে, সেরূপ ভাব আসিল না; অন্য প্রকার একটি ভাব আসিতে লাগিল—ত্রাসও নয়, উদ্বেগও নয়; কিন্তু ইচ্ছা* হইল, চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। কেহই কোনো কথা কহিতেছে না; লোকটি যখন নিজে ইচ্ছা করিয়া কথা কহিতেছে, তখনই কথা হইতেছে মাত্র। গ্যাসের বাতি দুটির সোঁ-সোঁ করিয়া আওয়াজ হইতেছে। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ, যেন ঘরে একেবারেই মানুষ নাই।

খুব স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, লোকটি পাড়াগেঁয়ে, অশিক্ষিত; মাঝে মাঝে, অসভ্য ভাষায় কথা কহিতেছে। কিন্তু, লোকটি পাগলও নয়, যে নিতান্ত এলো-মেলো ভাব। আফিমখোরের ভাবও নয়, যে নিঝুম হইয়া আছে। পাগল হইলে এলোমেলো ভাব হয়, বড় হাত-পা নাড়ে, মাথা নাড়ে; এ লোক সেরূপ নয়। আবার যে, বালকের ভাব, সে রকমও তো নয়; কারণ, ছোট ছেলেদের ভিতর নিরবচ্ছিন্নতার, অর্থাৎ, Continuance-এর ভাবটি থাকে না। আবার যে, সাধারণ লোক, তাহাও তো দেখিতেছি না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন যে লোক—নানা বিষয়ে বেশ পরামর্শ দিতে পারে, তাহাও তো দেখিতেছি না। তর্ক, যুক্তি ও নানা রকম দার্শনিক মত, যাহা আমরা সর্বদা

শুনিতাম, এ ব্যক্তি তো সে রকম কিছু কথা বলিতেছে না। দেখিলাম, লোকটি হড়বড় করিয়াও কথা বলিতেছে না, বা যাহাকে বলে 'প্রগল্‌ভ', তাহাও তো নয়। কলিকাতায় যেমন বক্তৃতা শুনিতাম, বক্তা অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছে; এ লোকটি তো তেমনও কিছু বলিতেছে না। পণ্ডিতগিরি ফলানো বা গুরুগিরি করাও তো নাই।—লোকটি যেন তাহার মনটিকে উচ্চ স্তর হইতে নামাইয়া আনিয়া কথা কহিতেছে; আর, না হইলে, এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। কেহই তাহার সহিত তর্ক-যুক্তি করিতেছে না। কেহই প্রশ্ন করিতেছে না, বা করিবারও কাহারো ইচ্ছা নাই। লোকটি যাহা বলিতেছে, তাহাই সকলে স্থির হইয়া শুনিতেছে। সকলেই তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে যে, সে কখন্ কি বলিবে।

আর একটি বিষয় দেখিলাম যে, শ্যামা-বিষয়ক বা বৈষ্ণবদিগের গান তো চলিত গান, এ সকল বহু বার শুনিয়াছি, নূতনত্ব কিছুই নাই; কিন্তু এই লোকটি যখন, মাঝে মাঝে, সেই সকল চলিত গানই গাহিতেছে, তখন মনে অন্য এক প্রকার ভাব আসিতেছে, সে যেন অন্য এক ভাবে গানটিকে দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে, সে যেন স্থির হইয়া যাইতেছে; আবার, যেন গলা শুখাইয়া যাইতেছে বলিয়া, বটুয়া হইতে একটু একটু মসলা লইয়া মুখে দিতেছে। কথাবার্তা যাহা বলিতেছে, তাহা মনে রাখা যাইতেছে না। কিন্তু কথাগুলি যে ঠিক, সত্য—এ বিষয় কোনো সন্দেহই হইতেছে না। তর্ক করিবার ইচ্ছা হইতেছে না। কথাগুলি যে নিশ্চিত ও নির্দ্বন্দ্ব —এই ভাবটি যেন ভিতরে আসিতেছে। শব্দ ও ভাব এত তাড়াতাড়ি আসিতেছে যে, কথাগুলি মনে রাখিবার সুবিধা হইতেছে না, এবং সময়ও পাওয়া যাইতেছে না। কথাগুলি

শুনিবার বিষয়; কিন্তু তাহার অর্থ জানি না, তাৎপর্যও কিছু বুঝি না।

সকলেই যেন এক প্রকার ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল। বেশ একটু ঘোরপানা আচ্ছন্ন-ভাব আসিতে লাগিল। অন্য কোনো বিষয়ঃ ক্ষুধা পাইয়াছে; তৃষ্ণা পাইয়াছে, জলপান করিব; বা, অধিক রাত্রি হইয়াছে, বাড়ি ফিরিয়া যাইব—এ সকল কোনো চিন্তাই মনে আসিতেছিল না। সকলেই স্থির ও নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পরে দেখি যে, লোকটি কথা কহিতে কহিতে স্থির হইয়া গেল। ডান হাতের মাঝের আঙুল তিনটি বাঁকিয়া গেল। হাত দুটি সিধা ও শক্ত হইয়া গেল। মিরগি হওয়া আমরা ঢের দেখিয়াছি, কিন্তু এ তো তা নয়। আমরা সকলে তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। মিরগি হইলে, মুখে চোখে জল দিতে হয়, বাতাস করিতে হয়; এ-কে তো সেরূপ করিতে হইতেছে না। এই নূতন ব্যাপার দেখিয়া আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এই মাত্র বিশেষ-ভাবে বুঝিলাম যে, মনটাকে উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া লোকটি কথা কহিতেছে, এবং আমাদের মনকে যেন আটা দিয়া জুড়িয়া উপর দিকে লইয়া যাইতেছে। দেখিলাম যে, লোকটির প্রতি একটা টান আসিল। এ টান—ভালবাসা বা স্নেহ-মমতা নয়। কারণ, এগুলি নিম্ন স্তরের লোকের প্রতি হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তিও নয়; তাহা হইলে উচ্চ-নীচ জ্ঞান থাকে ও ভয় থাকে। এ টান ভিতরের; লোকটির কাছে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে।

আমাদের বাড়ি তখন বড়মানুষের বাড়ি, পাড়ার সকল লোকের বসিবার জায়গা। এইজন্য, আমরা বহু প্রকার লোক দেখিতে পাইতাম; বহু প্রকার লোকের সঙ্গে আমরা

মিশিতাম। কিন্তু দেখিলাম যে, এই লোকটিকে কোনো বিশেষ থাকের বা শ্রেণীর ভিতর ফেলা যাইতেছে না। সকল শ্রেণী হইতে পৃথক্, অথচ যেন কিছু সম্পর্ক আছে। আমাদের তখন বয়স অল্প; এইজন্য, প্রথমটায় সব গোল হইয়া গিয়াছিল।

আমরা যখন ছাদে খাইতে যাইলাম, তখন দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সকলেই একসঙ্গে বসিয়া খাইতেছেন; অন্য পাড়ার দু-পাঁচ জন লোকও তাহার ভিতর আছেন। অবশ্য, নিরামিষ রান্না—লুচি-তরকারি ইত্যাদি হইয়াছিল। তখনকার দিনে সকল জাতের সঙ্গে একত্র খাওয়ার প্রথা ছিল না। তখন বাড়িতে যাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবার প্রথা ছিল; কিন্তু দেখিলাম যে, এখানে সকলে অ-নিমন্ত্রিতভাবে খাইতেছেন। 'ইয়ার' লইয়া হাসি-তামাশা করিয়া যে খাওয়া, তাহা নয়। যজ্ঞিবাড়ির যে খাওয়া, তাহাও নয়। যজ্ঞিবাড়িতে খাইলে অনেক সময় একটা বেগারঠেলার খাওয়ার ভাব থাকে। যজ্ঞিবাড়ির বেগারঠেলার খাওয়াতে ও এ-খাওয়াতে অনেক তফাৎ বোধ হইল। এখানে যেন সকলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া খাইতেছেন, কেহই অবজ্ঞার ভাবে খাইতেছেন না। যে সকল লোক একসঙ্গে খাইতেছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর একটি টান দেখা গেল; যেন নিজের লোক বলিয়া একটি ভাব আসিল।

আহারাদি করিয়া আমরা সকলে নীচে নামিয়া আসিলাম। পরমহংস মশাই, রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময়, গাড়ি করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, প্রায় তিন দিন কি-রকম-একটি ঘোর ঘোর নেশা রহিল। যেমন সকলে সাধারণ কাজ করিয়া থাকে, তাহাও করিতেছি, কিন্তু মনটা যেন পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে, সব

জিনিসের সহিত মাখামাখি হইয়া থাকিতেছে না, মনটা যেন সব জিনিস হইতে তফাৎ থাকিতেছে, বেশি মেশামিশি করিতে চাহিতেছে না। পরমহংস মশাই চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি ভিতর হইতে একটি টান রহিয়া গেল; সেটা যে অন্য প্রকারের জিনিস, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এই হইল প্রথম দিনকার দর্শনের কথা।

লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তন

পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে এইরূপ বারকতক আসা-যাওয়া করাতে, পাড়ার লোকের তাঁহার প্রতি আর বিদ্বেষভাব কিছু রহিল না, কেহ উপহাসও করিত না। সকলেই তাঁহাকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিল। এখন হইতে জনসমাগমও কিছু অধিক হইতে লাগিল। তবে, একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল এই যে, এই ব্যাপারে, কাহাকেও গিয়া নিমন্ত্রণ করা হইত না। সামাজিক কোনো কার্যে যেমন বাড়িতে গিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইত, তেমন করিতে হইত না। কেবল, এই কথা বলিলেই হইত যে, অমুক দিন পরমহংস মশাই রামডাক্তারের বাড়িতে আসিবেন; তাহা হইলেই, যাঁহারা পরমহংস মশাইকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, তাঁহারা সকলেই সন্ধ্যার সময় সেখানে যাইতেন। ক্রমে, চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক হইতে এক শত বা দেড়-শত লোক হইতে লাগিল।

এই সময়, পাড়ার মহেন্দ্র গোসাঁই পরমহংস মশাই-এর সহিত এক দিন দেখা করিতে আসিলেন। তিনি পাড়ার প্রধান লোক ও গোস্বামী; এইজন্য, বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকের জানালা দুইটির মাঝখানে, পরমহংস মশাই-এর ডান ধারে, একখানি আসন পাতিয়া তাঁহার বসিবার স্থান করিয়া

দেওয়া হইল। পাড়ার মহেন্দ্র গোসাঁই আসিলেও কিন্তু, কোনো ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিতেন না; ইহা আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পরমহংস মশাই ছিলেন মাড়েদের ঠাকুরবাড়ির পূজরী—মাহিষ্যদের পূজরী, তাহার উপর গলায় পইতা ছিল না; এইজন্য ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে রাজী ছিলেন না, আর, এই কারণেই, ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার কাছে আসিতেন না। দক্ষিণেশ্বর ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। সেখানকার ব্রাহ্মণেরাও পরমহংস মশাইকে সেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। কেবল, যোগেন চৌধুরী[১] একাই পরমহংস মশাই-এর নিকট আসিতেন। তখনকার দিনে জাত লইয়া এক ফেসাদ ছিল!

বৈঠকখানায় বসিবার ব্যবস্থা

প্রথমে, পরমহংস মশাই সাধারণ লোকের মতো তক্তাপোশের উপর জাজিমে বসিতেন; কিন্তু তিনি ক-এক বার আসিবার পর, তাঁহার বসিবার জন্য একখানি বিলাতী গালিচা হইল; একটি তাকিয়াও হইল। এই গালিচাখানিতে শুধু তিনিই বসিতেন, অপর কেহ বসিত না; তাকিয়াটিও অপর কেহ ব্যবহার করিত না। তিনি আসিয়া চলিয়া যাইলে, এগুলি আলাদা করিয়া তুলিয়া রাখা হইত। একটি কাঁচের গেলাসও হইল; সেইটিতে জল দিয়া, তাঁহার ডান হাতের কাছে, বটুয়ার নিকট, রাখা হইত। গরমিকাল। এইজন্য, পিছন হইতে একখানি এড়ানী পাখা দিয়া পরমহংস মশাইকে বাতাস করা হইত। ঘরের ভিতর যে-যাহার নিজ নিজ স্থানে আসিয়া বসিতেন। লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায়, কেহ ঘরের সম্মুখে

১ শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, উত্তরকালে, স্বামী যোগানন্দ

দালানে বেঞ্চি পাতিয়া, কেহ বা রাস্তার ধারের রকটিতে, অথবা রাস্তায় বেঞ্চি পাতিয়া বসিতেন; কারণ, সকলের বসিবার জায়গা ঘরটির ভিতর হইত না।

ক্রমে ক্রমে, স্ত্রীলোকেরাও পরমহংস মশাইকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। আমার মা-ও যাইতেন। বৈঠকখানার দক্ষিণ দিকে যে ছোট দালানটি ছিল, সেইখানে মেয়েরা বসিতেন। মেয়েদের সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশ হইত। মেয়েরা যেদিকে বসিতেন, সেদিকে আলো দেওয়া হইত না। মাঝ-খানকার জানালা দুটির কবাট খোলা থাকিত, এবং পরমহংস মশাই-এর বসিবার জায়গা, একটু জানালার দিক্, অর্থাৎ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ করিয়া হইত। এইরূপ ব্যবস্থায়, স্ত্রীলোকেরা পরমহংস মশাইকে দেখিতে পাইতেন ও তাঁহার সকল কথা শুনিতে পাইতেন; কিন্তু, সেখানে আলো না দেওয়ায়, ঘরের ভিতর হইতে কেহ মেয়েদের দেখিতে পাইত না। এই ছিল বসিবার বন্দোবস্ত। চিক বা পর্দা দিবার আবশ্যক হইত না।

রামদাদার অসুখের জন্য তামাকের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকার আরো একটি কারণ ছিল, পরমহংস মশাই-এর সম্মুখে কেহ তামাক খাইত না। পান দেওয়ারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না; কারণ, এখন যেমন বাড়িতে অভ্যাগত আসিলে পান দেওয়া হয়, তখন তেমন পান দেওয়ার রীতিই ছিল না।

কীর্তনগায়ক যুবক

পরমহংস মশাই কিছু দিন আসিতে থাকিলে পর, রামদাদা একটি কীর্তনগায়ক ছেলেকে ভাড়া করিয়া লইয়া আসিলেন। ছেলেটির বয়স আঠারো কি উনিশ বৎসর হইবে। বাহিরের কোনো গ্রামের ছেলে, কলিকাতার নয়। ছেলেটি কোমরে

চাদর বাঁধিয়া, হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, কি এক দূতী-সংবাদ গাহিল। আমরা কলিকাতার লোক; এ রকম গান করিলে ঠাট্টা করিতাম ও অতি ঘৃণা করিতাম। আমাদের এ সব গান ভাল লাগিত না। আর, জোয়ান বেটাছেলে হইয়া মেয়েলী ঢঙে হাত নাড়া, আমরা কলিকাতার লোক হইয়া বড় দূষণীয় মনে করিতাম। আমার মনে হইল—এ ছোঁড়া পড়াশুনা করে না, কেবল মেয়েদের মতো হাত নেড়ে গান করে। এইজন্য, আমি তাহার উপর বিরক্ত হইলাম; কারণ, কলিকাতায় তখন জিম্‌ন্যাষ্টিক করা ও কুস্তি করাই ছিল প্রথা। জোয়ান ছেলের মেয়েলী ঢঙে হাত নাড়া ও সখী-সংবাদ গান করা অতি হাস্যকর বলিয়া মনে হইল; কিন্তু দেখিলাম, কেহ কিছু বলিল না। অনেকক্ষণ কীর্তন হইবার পর, পরমহংস মশাই উপরে আহার করিতে যাইলেন, এবং কিছু পরে, আমরাও ছাদের উপর আহার করিতে যাইলাম।

আহার করিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিলে, অনেকেই তখন চলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরমহংস মশাই-এর গাড়ি আসিতে দেরি ছিল, এইজন্য, বাহিরের ঘরটিতে বসিয়া তিনি সেই কীর্তনগায়ক ছেলেটিকে, কি করিয়া হাত নাড়িতে হয়, কোমর বাঁকাইয়া দাঁড়াইতে হয়, প্রভৃতি শিখাইতেছিলেন। ছেলেটিও দু-চার বার কস্ত করিয়া তাহা অভ্যাস করিতে লাগিল। আমি দরজার কাছে তক্তাপোশে বসিয়া এ সকল দেখিতেছিলাম ও মনে মনে হাসিতেছিলাম।

সেই কীর্তনগায়ক ছেলেটির নাম জানি না, এবং তাহাকে আর কখনো দেখিয়াছি কিনা তাহাও স্মরণ নাই।

ভাগবত-আলোচনা

পাড়ার মহেন্দ্র গোসাঁই, মাঝে মাঝে, পরমহংস মশাই-এর

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। মহেন্দ্র গোসাঁই-এর সহিত তাঁহার ভাগবত ও ভক্তি বিষয়ে নানারূপ আলোচনা হইত। মহেন্দ্র গোসাঁই তাঁহার কথাবার্তায় পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। এক দিনকার কথা আমার একটু মাত্র মনে আছে। যেন এই ভাবের একটি কথা উঠিল—ভক্তি বড়, কি মুক্তি বড়? পরমহংস মশাই বলিলেন, "মুক্তি দিতে নারাজ নই, ভক্তি দিতে নারি।" তবে, সে সময় কথাবার্তা বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই। এইজন্য, স্পষ্টভাবে কিছু মনে নাই।

দেখিতাম, ভক্তির কথা উঠিলে পরমহংস মশাই পুরামাত্রায় বৈষ্ণব ভক্ত হইতেন, আবার যখন শ্যামা-বিষয়ক গান করিতেন, তখন ঠিক সেই ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন।

আহারের সময়

পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে আসিবেন জানিতে পারিলেই, আমি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতাম। এক দিন, শনিবার সন্ধ্যার সময়, পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে আসিয়াছিলেন। আমি কাপড়-চোপড় পরিয়া রামদাদার বাড়িতে যাইলাম। সকাল হইতে আমার খুব আমাশা হইয়াছিল, সেইজন্য কিছুই খাই নাই; সাগু-বার্লিও নয়। ছাদে খাইতে যাইলাম, তখনো পেটে বড় যন্ত্রণা হইতেছিল। একখানি মাত্র পটল-ভাজা দিয়া গরম লুচি আকণ্ঠ খাইলাম, জল খাই নাই। কিন্তু তাহাতেই আমার আমাশা ভাল হইয়া গেল। পরে, এক সময়, বলরামবাবুকে[১] এই কথা বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ঠিক ওষুধ, গরম লুচি হচ্ছে আমাশার ওষুধ। তুমি অজান্তে ঠিক ওষুধ খেয়েছিলে।"

১ শ্রীযুত বলরাম বসু

আহার করিবার সময় পরমহংস মশাই উপরে যাইতেন। নীচের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, দোতলায়, পূর্ব-পশ্চিমমুখো যে দালানটি ছিল, সেখানে তাঁহার জন্য একটি আসন পাতা হইত। তিনি একলা বসিয়া আহার করিতেন, পঙ্‌ক্তির ভিতর বসিতেন না। সাদা পাথরের থালা ও গেলাসে তিনি কিছু আহার করিতেন। এই থালা ও গেলাস, ইত্যাদি অপর কেহ ব্যবহার করিত না। সাধারণ লোক তেতলার ছাদে আহার করিত। দালানটি দিয়া তেতলায় যাইবার সিঁড়ি। ঠাঁই ও পরিবেশন করিবার জন্য লোকে এই দালান দিয়া উপরে যাতায়াত করিত। আহারের সময় ছাদের প্রায় সবটা ভরিয়া যাইত। আন্দাজ, শ-দেড়েক লোক ছাদে এক বারে বসিতে পারিত।

এক দিন দেখিলাম যে, পরমহংস মশাই দালানের মাঝ-খানটিতে বসিয়া আহার করিতেছেন, আর ভিন্ন ভিন্ন বাড়ির মেয়েরা আসিয়া, তাঁহার বাঁ-দিকে ও সম্মুখে বসিয়া আছেন; কাহারো মাথায় ঘোমটা নাই, সকলের মুখ খোলা। তখন-কার দিনে, মুখের ঘোমটা খুলিয়া কোনো স্ত্রীলোকই পুরুষ-মানুষের সম্মুখে যাইতেন না। স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই ঘোমটা দিয়া থাকিতেন। কিন্তু, আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিলাম যে, ভিন্ন বাড়ির ভিন্ন বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা পরমহংস মশাই-এর কাছে মুখের কাপড় খুলিয়া বসিয়া আছেন, কোনো দ্বিধা বা সংকোচ করিতেছেন না; এমন কি, যে সকল যুবা পুরুষ উপরে পরিবেশন করিতে যাইতেছে, তাহারাও, মাঝে মাঝে, দু-এক মিনিট দাঁড়াইয়া, পরমহংস মশাইকে দেখিয়া যাইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের ভিতর সব বয়সেরই মেয়ে ছিল, কিন্তু অপরিচিত পুরুষদের দেখিয়া কেহই দ্বিধা বা সংকোচ করিল না; পুরুষরাও স্ত্রীলোকদের দেখিয়া দ্বিধা বা

সংকোচ করিল না। পরমহংস মশাই তখন হাঁটু দুটি উঁচু করিয়া আসনখানির উপর বসিয়া কি আহার করিতে-ছিলেন।

কী আশ্চর্য ভাব! কাহারো মনে দ্বিধা বা সংকোচ নাই, লজ্জা বা কোনো প্রকার দৈহিক ভাব একেবারেই নাই। সকলেই পরমহংস মশাই-এর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, দেহজ্ঞান একেবারেই নাই। কেবা স্ত্রী, কেবা পুরুষ—এ সব চিন্তা কাহারো নাই, যেন অন্য এক রাজ্যে সকলে রহিয়াছেন। অথচ সকলেই পরস্পর অচেনা!

এক বার যীশু, Mount of Olives বা জলপাই পাহাড়ে, মার্থা ও মেরী নামে দুই ভগিনীর বাড়িতে গিয়া-ছিলেন। মার্থা যীশুর সেবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মেরী যীশুর পায়ের কাছে বসিয়া বিভোর হইয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন। মার্থা আসিয়া যীশুর কাছে অভিযোগ করিলেন, "আপনি কি দেখছেন না, মেরী আমায় কাজে একলা ফেলে এসেছে? ওকে আমায় একটু সাহায্য করতে বলুন।" যীশু মার্থার দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর করিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি বহু বিষয়ে উদ্বিগ্ন, বহু বিষয়ে ব্যস্ত। একটি জিনিষ দরকারী এবং মেরী তা পাবার জন্য মনঃস্থ করেছে, যা তার কাছ থেকে অপহৃত হবে না।"—অর্থাৎ, মেরী যে যীশুর কথা নিবিষ্টমনে শুনিতেছিলেন, তাহা অনেক উচ্চ স্তরের বিষয়, আহারাদি অনেক নিম্ন স্তরের কার্য।

আমি জেরুসালেম-এ অবস্থানকালে জলপাই পাহাড়ের এই স্থানটিতে সর্বদাই যাইতাম। এখন গ্রামটির নাম হইয়াছে এল'অ্যাজ.ারিএ বা লাজ.ারিএ, অর্থাৎ, লাজ.ারস-এর গ্রাম।

মার্থা ও মেরীর ভাই-এর নাম ছিল লাজ.ারস। এই গ্রামটির প্রাচীন নাম ছিল বেথানী।

গৌতম কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া উরুবিল্বে বা বুদ্ধগয়ায় যখন এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, তখন নন্দা আর বালা নামে ব্রাহ্মণের দুইটি কন্যকা, দুগ্ধ-মধু ইত্যাদি দিয়া কিছু আহার্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া সন্ন্যাসী গৌতমকে দিবার প্রয়াস পাইল। অনন্তর, সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া গৌতম তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে কন্যকা দুইটি এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল, যেন শুদ্ধোদন রাজার পুত্র সিদ্ধার্থের সহিত তাহাদের বিবাহ হয়, কারণ তাহারা শুনিয়াছিল যে, সিদ্ধার্থ অতি সুপুরুষ। গৌতম তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগিনীদ্বয়, আমিই সেই শুদ্ধোদন রাজার পুত্র, সিদ্ধার্থ। আমি ত আর দারপরিগ্রহ করিব না।" কন্যকাদ্বয়, নন্দা ও বালা, তাহাতে কিছু অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। কিন্তু তাপস গৌতমের স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ভাব দেখিয়া তাহাদের লজ্জা ও দ্বিধা বা সংকোচের ভাব চলিয়া যাইল। উভয়ে শান্তভাবে বলিল, "আপনি আশীর্বাদ করুন, আপনি সিদ্ধ হইলে যেন আমরা আপনার শিষ্যা হইতে পারি।"

দেখিয়াছি, পরমহংস মশাই-এর গা হইতে কি একটি আভা বাহির হইত, তাহাতে কাহারো দেহজ্ঞান বা অন্য কোনো ভাব থাকিত না; মন যেন দেহ ছাড়িয়া অপর কোন্ এক রাজ্যে চলিয়া যাইত, হাত-পা অজ্ঞাতসারে কাজ করিত মাত্র। যুবকেরা, পরিবেশন করিতে হয় সেইজন্যই করিত, কিন্তু তাহাদের মনটা পরমহংস মশাই-এর কাছে পড়িয়া থাকিত। মেয়েদেরও ঠিক এই ভাবটি হইত। যাহাকে

বলে—মুহূর্তের মধ্যে বিদেহ হইয়া যাওয়া, পরমহংস মশাই চকিতের ভিতর তাহা করিয়া দিতেন। এই ব্যাপারটি আমি ভাষা দিয়া বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এ বিষয়ে চিন্তা করিলে কিছু মাত্র বুঝা যাইতে পারে। ইহা তর্ক-যুক্তির কথা নয়, গভীর ধ্যানের বিষয়। এইটি আমি বহু বার লক্ষ্য করিয়াছি।

ছাপ মেরো না

যুবা শশী[১] যখন রামদাদার বাড়িতে আসিতে লাগিল, বোধ হয়, তখন সে 'সেকেণ্ড ঈয়ার ক্লাস'-এ পড়ে। দেখিতে কৃশ, রং ফরসা। গালে কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো কিছু দাড়ি, লম্বা দাড়ি নয়। যুবা শশীকে দেখিতাম যে, নিবিষ্টমনে কান খাড়া করিয়া, পরমহংস মশাই-এর পিছনে, ডান দিকে বসিত। যদিও সে মনোযোগ দিয়া ঐ সকল কথা শুনিত, তবুও সে কিছু লিখিয়া রাখে নাই।

পরমহংস মশাই-এর আসিবার কিছু দিন পরে, *** মশাইকে রামদাদার বাড়িতে আসিতে দেখিলাম। পরমহংস মশাই-এর বাঁ-হাতের পিছন দিক্‌টায়, দেওয়ালের আলমারির কাছে, তিনি চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং একমনে পরমহংস মশাই কি বলিতেছেন, তাহাই শুনিতে চেষ্টা করিতেন। সুরেশ মিত্তির তাঁহাকে বলিতেন, "কি ***, নোট করবে নাকি?"

পরমহংস মশাইকে এরূপ সময় দু-এক বার বলিতে শুনিয়াছি, "এ সকল কথায় ছাপ মেরো না।" তবে, তিনি কাহার উদ্দেশে এবং কী অর্থে এই কথা বলিতেন, তাহা

১ শ্রীযুত শশীভূষণ চক্রবর্তী, পরে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

বলিতে পারি না। হয়তো, ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, এ সকল উচ্চ অঙ্গের কথা, এ সকল কথাকে ভাষায় প্রকাশ করিলে, ইহার ভাব বিকৃত হইয়া যাইবে; কিংবা, হাট-বাজারে এই সকল কথা দিও না, কারণ, সাধারণ লোকে এই সকল উচ্চ অঙ্গের কথা বুঝিতে পারিবে না। অপর অর্থ এই হইতে পারে যে, এই সকল কথা ছাপাইয়া পয়সা করিও না; কারণ, ব্রহ্মবাণী বেচিয়া পয়সা করা এবং নিজের স্বার্থের জন্য তাহা ব্যবহার করা দূষণীয়। ব্রহ্মবাণী কখনো স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে নাই; অযাচিতভাবে ইহা পাইয়াছ, অযাচিতভাবে ইহা বিতরণ করিবে—এই হইল সনাতন প্রথা।

যুবা শশীর আক্ষেপ

পরমহংস মশাই, ডান হাতের কাছে যে জলের গেলাসটি থাকিত, সমাধি ভাঙিবার পর, তাহা হইতে এক ঢোক জল খাইতেন। সমাধি ভাঙিলে একটু জল খাইবার জন্য তিনি যখন হাত বাড়াইয়া দিতেন, তখন যুবা শশী সেই জলের গেলাসটি আগাইয়া দিত। এক দিন, ঘটনাক্রমে, সেই জলের গেলাসে তাহার পা ঠেকিয়া গিয়াছিল। জল বদলাইবার সময়ও ছিল না, অগত্যা, সেই জলের গেলাসটিই পরমহংস মশাই-এর হাতে আগাইয়া দিতে হইল। পরমহংস মশাই সেই জলই পান করিলেন। যুবা শশীর মনে এই আক্ষেপ চিরকাল ছিল যে, সে জানিয়া-শুনিয়া পরমহংস মশাইকে ঐ জল দিয়াছিল। যুবা শশী আক্ষেপ করিয়া অনেক সময় এ বিষয় উল্লেখ করিত। অবশ্য, এইরূপ হইবার কারণ এই যে, ঐ জলের গেলাসটি তাহাকে চকিতের ভিতর আগাইয়া দিতে হইত, বোধ হয়, এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ কাজ করিতে হইত।

কী সাজাবি আমায়

পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে আসিলে সুরেশ মিত্তির আনন্দে বিভোর হইয়া অনবরত পায়চারি করিতেন এবং সকল লোকের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি ভাবে এত মাতোয়ারা হইয়া পড়িতেন যে, কখনো ঘরটির ভিতর বসিতে পারিতেন না।

গরমিকালে, এক দিন সুরেশ মিত্তির ফরমাশ দিয়া একটি অতি সুন্দর বেলফুলের গ'ড়ে মালা আনাইয়াছিলেন। মালাটি বেশ বড়; এত বড় যে, গলায় দিয়া দাঁড়াইলে, মালাটি জাজিমের উপর পড়িয়া আরো খানিকটা বেশী থাকে। মালাটির নীচের দিকে কতকগুলি ফুল দিয়া একটি তোড়ার মতো করা—ফুলের থোবনা, আর, মালার মাঝে মাঝে রঙিন ফুল ও জরি দেওয়া তবক। মালাটি যত দূর সম্ভব উৎকৃষ্ট। সুরেশ মিত্তির আনন্দে বড় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি একটি রূপার বাটিতে গোলাবজল ঢালিয়া বাঁ-হাতে লইয়াছেন, ডান হাতে একটি রূপার ঝাঁজরিওয়ালা পিচকারি, চোঙা-মুখো নয়। রূপার পিচকারিটি দুই আঙুল দিয়া ধরিবার জন্য দুটি আঙটা বা কড়া আছে, এবং পিচকারির ডাঁটিটি বুড়ো আঙুল দিয়া তুলিবার জন্যও একটি আঙটা বা কড়া আছে। সুরেশ মিত্তির পিচকারি দিয়া সকলের মাথায় গোলাব-জল দিতেছেন। তাহার পর, ঐ মালাটি লইয়া পরমহংস মশাই-এর গলায় পরাইয়া দিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিলেন। পরমহংস মশাই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। মালাটি তক্তাপোশের উপর জাজিমে ঠেকিয়া লুটাইতে লাগিল। পরমহংস মশাই-এর সমাধি-অবস্থা আসিতে লাগিল। কখনো বা তিনি ডান হাতের আঙুল দিয়া নিজের শরীরের দিকে দেখাইতে

লাগিলেন, কখনো বা উপর দিকে নির্দেশ করিতে লাগিলেন, ও মৃদু মৃদু স্বরে এই গানটি গাহিতে শুরু করিলেন:

"আর কী সাজাবি আমায়,
জগত-চন্দ্র-হার আমি পরেছি গলায় ** ।"

গানটি গাহিয়া নানা প্রকার হাতের ভঙ্গী করিয়া উপরের দিকে দেখাইতে লাগিলেন। ঠিক যেন এই ভাবটি তখন প্রকাশ হইতে লাগিল—কি একটা ফুলের মালা গলায় পরাচ্ছ ; আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র সব তো আমার গলায় হারের মতো রয়েছে। অর্থাৎ, এই ক্ষুদ্র দেহটির ভিতর এক বিরাট পুরুষ রহিয়াছেন ; চন্দ্রাদি গ্রহসমূহ তাঁহার গলার হারের মতো ; তিনি আরো ঊর্ধ্বের লোক—তিনি বিরাট, অসীম, অনন্ত ও মহান্। এই ক্ষুদ্র দেহটিতে একটি ক্ষুদ্র মালা পরাইয়া কী-বা আশ্চর্য কাজ করিতেছ !

গানটি তিনবার বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। কিন্তু, তাঁহার কণ্ঠস্বর এত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সেই কণ্ঠস্বর এখনো আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে। তিনি যেন হাত নাড়িয়া বলিতেছেন: জগৎ তুচ্ছ ; জগতের এই জিনিস দিয়ে আমায় কী সাজাবে ? অনন্ত, অনন্ত সব গ্রহ-তারা ; আমি তো সর্বদাই সেই সকল প'রে থাকি। তার চেয়ে আমার মাথা আরো উপরে।

এই বিষয়টি আমার ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। মুখের ভাব, হাতের ভঙ্গী ও কণ্ঠের স্বর দিয়া তিনি এমন একটি ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, অসীম অনন্তের ভাবটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। 'শব্দ' হইতে মনকে 'শক্তি'-তে লইয়া যাওয়া, ইহাকেই বলে। আমরা তো প্রথমে ফুলের মালা দেখিয়াই খুব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম ; কিন্তু, এই গানটি বা নাদব্রহ্ম শুনিয়া মন অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছিল।

কীর্তন ও নৃত্যে

অনেক সময় বৈঠকখানায় কথাবার্তা শেষ হইলে, পরমহংস মশাই দক্ষিণ দিকের ছোট উঠানটিতে গিয়া কীর্তন করিতেন। এই সময় দেখিতাম যে, পরমহংস মশাই তাঁহার কোঁচার কাপড়টি ফেটি করিয়া কোমরে বাঁধিতেন, অর্থাৎ, কোঁচার কাপড়টি কোমরে দিয়া একটি গাঁট-বাঁধা করিতেন। জামাটি গায়ে থাকিত। অন্য সময়, তিনি কখনো কাপড়টি কোঁচা দিয়া রাখিতেন, কখনো বা কোঁচাটি খুলিয়া লম্বা চাদরের মতো করিয়া কাঁধে ফেলিতেন। তিনি উঠানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণটিতে উত্তর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতেন। রামদাদা প্রায়ই তাঁহার ডান হাতের কাছে দাঁড়াইতেন। মনোমোহনদাদা বাঁ-হাতের কাছে দাঁড়াইতেন। অপর সকল ব্যক্তি, মাঝে খানিকটা ফাঁক রাখিয়া, পূর্ব দিকে ও উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথ ও অঘোর ভাদুড়ী (ডাক্তার বিহারী ভাদুড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র), ইহারা দুই জন উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। নরেন্দ্রনাথ সেই সময় চোখ বুজাইয়া ধ্যানের ভাবে থাকিত। যুবা রাখাল বড় লাজুক ছিল, এইজন্য সে ভিড়ের ভিতর পিছনে লুকাইয়া থাকিত, কখনো সম্মুখে যাইত না। কখনো কখনো রামদাদার অপর এক মাসতুতো ভাই, নৃত্যগোপালদাদাও[১] কীর্তনে থাকিতেন।

রামদাদা ও মনোমোহনদাদা প্রথমে কীর্তনের গান আরম্ভ করিতেন। কীর্তনে খোল-খত্তাল বাজিত না। এক দিনকার কীর্তনের গান একটু মাত্র স্মরণ আছে। গানটি হইল :

১ শ্রীযুত নৃত্যগোপাল বসু, পরে, স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত

"হরি বলে আমার গৌর নাচে,
নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে ** ।"

এইটুকু আমার স্মরণ আছে, আর কিছু স্মরণ নাই। রামদাদা ও মনোমোহনদাদা কীর্তনের গান আরম্ভ করিলে, পরমহংস মশাই মৃদুস্বরে সামান্য কীর্তন গাহিতেন এবং মাঝে মাঝে করতালি দিতেন। তাহার পর তাঁহার ভাবাবেশ হইত, একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন; তখন ঘাড় একটু ডান দিকে বাঁকিয়া যাইত, চোখ নিমীলিত হইত। তিনি তখন হাত দুটি সম্মুখের দিকে লম্বা করিয়া প্রসারিত করিতেন, এবং ভাবের আবেশে সম্মুখের দিকে ক-এক হাত অগ্রসর হইয়া যাইতেন ও আবার পিছন দিকে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপ ভাবাবেশে যখন তিনি সম্মুখে ও পিছনে চলাচল করিতেন, তখন কেবল রামদাদা ও মনোমোহনদাদা কীর্তন করিতে করিতে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন। এই নৃত্যের সময় পরমহংস মশাই-এর মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইত না। তিনি তখন একেবারে ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন; ঘাড়টি বাঁকাইয়া অতি গম্ভীর মুখ করিয়া সম্মুখে ও পিছনে কেবল যাওয়া-আসা করিতেন। রামদাদা ও মনোমোহনদাদা বা অপর কেহই কীর্তনে নৃত্য করিতেন না। সুরেশ মিত্তিরকে কখনো কীর্তনে নৃত্য করিতে দেখি নাই। তিনি চশমাটি চোখে দিয়া পূর্ব দিকের ছোট দালানটির এক ধারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কখনো বা দুই হাতে সামান্যভাবে একটু করতালি দিতেন। মাস্টার মশাইকে কীর্তনে নৃত্য করিতে দেখি নাই। অপর সকলেও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপ, মিনিট আট-দশ চলাচল করিয়া পরমহংস মশাই স্থির হইয়া যাইতেন, আর যেন কিছু বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। সেই সময়, রামদাদা ও মনোমোহন

দাদা তাঁহাকে পরিক্রম করিয়া করতালি দিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। পরমহংস মশাই-এর দেহ সেই সময় নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া যাইত। এইরূপ খানিকক্ষণ থাকিবার পর আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হইতেন। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল কীর্তন হইবার পর, সকলে পুনরায় বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া বসিলে, আহারাদির উদ্যোগ হইত। ছোট উঠানটিতে বহু বার পরমহংস মশাই-এর কীর্তন হইয়াছিল, তবে সব বারই প্রায় এইরূপ এক প্রথা অনুযায়ী।

পায়ে প্রণাম

গরমিকাল, এক দিন সকলের আহার হইয়া গিয়াছে, মুখ ধুইতে সকলে নীচে চলিয়া যাইল। পরমহংস মশাই উপরকার ছাদে যাইলেন; গায়ে ছোট আস্তিনওয়ালা একটি জামা, পায়ে বার্নিশ করা চটি-জুতা। পান খাইয়াছিলেন; ঠোঁট মুছিলেন। পূর্ব দিকের পাঁচিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। দাদা আমাকে ডাকিয়া পরমহংস মশাই-এর কাছে লইয়া গেল। আমি তাঁহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম। তখনকার দিনে পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া প্রণাম করার প্রথা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া এই আমার প্রথম প্রণাম করা। পরমহংস মশাই দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে অতি স্নেহের সহিত অনেক কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। দাদাও দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও পরমহংস মশাই-এর কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন। ভিড় কমিয়া যাইলে, আমি নীচে নামিয়া আসিলাম।

আকর্ষণী শক্তি

নীচুকার বৈঠকখানায় বসিয়া থাকিবার সময় হউক, উঠানে

কীর্তন করিবার সময় হউক, বা, খাওয়ার সময়ই হউক, পরমহংস মশাই-এর একটি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি দেখিতে পাইতাম। পরমহংস মশাইকে স্থির হইয়া দেখা—ইহাই যেন আমাদের প্রধান কাজ ছিল। তাঁহার কথাবার্তা অনেক সময় আমাদের মনে থাকিত না। দেখিতাম, এই তো সামান্য একজন পাড়াগেঁয়ে লোক, আর আমরা কলিকাতার শিক্ষিত লোক, সেই পাড়াগেঁয়ে লোকের কাছে বসিয়া আছি। আমাদের অনেকের মনে এরূপ ভাবও ছিল যে, আমরা কলিকাতার শিক্ষিত বড়ঘরের ছেলে, কেবল রামডাক্তারের খাতিরে বা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তাঁহার গুরু—এই সামান্য লোকটাকে দেখিতে আসিয়াছি। কিন্তু দেখিতাম যে, পরমহংস মশাই-এর শরীর হইতে কি একটি আভা (Effluvium) বা শক্তি বাহির হইত। শক্তি বা আভা কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া সমস্ত ঘরটি ভরিয়া ফেলিত, তাহার পর, সম্মুখের দালানটি ভরিয়া দিত। এমন কি, সেই আভা বা শক্তি জানালার গরাদের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া গিয়া রাস্তায় যেন ঢেউ খেলিত। আমি অনেক সময় এইটি দেখিতে পাইতাম। সেই সময়কার অনেকেই ইহা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে কথাবার্তাও হইত। প্রথম, যেন কি একটি শক্তি বা আভা আসিয়া ত্বক্ স্পর্শ করিত। ক্রমে, সেই শক্তিটি মাংসের ভিতর ঢুকিতে শুরু করিত, এবং, তাহার পর, ধীরে ধীরে, হৃদয়ের কাছে আসিতে থাকিত, ইহা বেশ অনুভব করা যাইত। তখন নিজের অন্তরস্থিত শক্তি বা ব্যক্তিত্বের সহিত বাহ্যিক এই শক্তির প্রবল দ্বন্দ্ব চলিত। অবশেষে, বাহ্যিক শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তিকে পরাভূত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিত; তাহার পর, ব্যক্তিত্ব বা নিজের কোনো একটি শক্তি বা ক্ষমতা—এ সব কিছুই থাকিত না।

কী যেন একটি শক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতাম! নিজের স্বাভাবিক যে সকল চিন্তা, ঘর-বাড়ির চিন্তা—এই সকল কিছুই থাকিত না। মন যেন কোথায় চলিয়া যাইত। দেহ ছাড়িয়া মনটা বা ভিতরটা যেন অন্য এক রাজ্যে চলিয়া যাইত। কাহারই বা দেহ, কাহারই বা মন; কাহারই বা বাসনা, কাহারই বা সংকল্প! জগৎ ও জগতের ক্রিয়াসমূহ দূরে পড়িয়া রহিয়াছে—একটা ছবির মতো। জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষা, মায়া-মমতা কিছুই নাই; এমন কি, নিজের হাত-পা বা দেহ যে আছে, সে বোধও থাকিত না। বিদেহ বা অশরীরী অবস্থা যেন হইয়া যাইত। চিন্তা, বাসনা ও তর্ক-যুক্তি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। এমন কি, জপ-ধ্যানও, যাহাকে ভগবৎ-লাভ বা সত্য-লাভের অতি শ্রেষ্ঠ উপায় বলা হইয়া থাকে, তাহাও বন্ধন বলিয়া মনে হইত। শ্রদ্ধেয় নাগ মশাই[১] এক বার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাইকে বলিয়াছিলেন, "এখানে[২] এসেছ, চোখ বুজে বসে আছ কেন? দেখতে এসেছ, চোখ খুলে দেখ।" কথাটি অতি সত্য। জপ-ধ্যানও সেখানে বন্ধন বা অন্তরায় হইয়া যাইত। এইরূপ অশরীরী ভাব সকলের ভিতর তিন দিন পর্যন্ত থাকিত; ঠিক হিসাব মতো বলিলে, আড়াই দিন থাকিত। জগৎটাকে যেন দেখা যাইতেছে—পূর্বের ঘর-দুয়ার ইত্যাদি সব-কিছুই, কিন্তু অ-সংলগ্নভাবে। যাহা করিবার, হাত-পায়ে তাহা করা যাইতেছে, কাজে কোনো ভুল হইতেছে না, কিন্তু মনটা যেন অন্য স্তরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর, ধীরে ধীরে, এই শক্তিটি চলিয়া যাইত, এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া যে-যাহার কাজ করিত।

১ শ্রীযুত দুর্গাচরণ নাগ

২ শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে

একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এক জন আর এক জনের গায়ের উপর কি যেন একটি আভা রহিয়াছে দেখিতে পাইত। এই আভা থাকার দরুন পরস্পরের মধ্যে একটি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আসিয়াছিল। ইহা ভালবাসা নয়; ভালবাসা ইহার কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস। পরমহংস মশাই-এর প্রতি যেমন একটি আন্তরিক আকর্ষণ হইয়াছিল, পরস্পরের প্রতিও সেইরূপ আকর্ষণ হইয়াছিল। এইজন্য, পরমহংস মশাই-এর একটি আত্মগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল; আর, এইজন্যই বাহিরের লোকেরা তাঁহার কাছে যাইতে তত ইচ্ছা করিত না। পরস্পরের সহিত না দেখা হইলে বড় কষ্ট বোধ হইত। দুই-তিন জন একসঙ্গে বসিয়া পরমহংস মশাই-এর সম্বন্ধে কথাবার্তা কহাই বড় আনন্দের বিষয় ছিল। রাস্তায় পরস্পরে দেখা হইলেই পরমহংস মশাই-এর কথাই হইত; সংসারের কথাবার্তা হইত না। অফিস হইতে আসিয়া, মুখ-হাত-পা না ধুইয়াই, দুই-তিন জনে বসিয়া বিভোর হইয়া পরমহংস মশাই-এর বিষয় কথাবার্তা কহিত। অন্য কোনো কথা, সামাজিকতা, বা পূর্ব বন্ধুদিগের সহিত মেলামেশা—এ সব আর ভাল লাগিত না। নিজেরা যেন অন্য এক রাজ্যের লোক। বাহিরের জগতের দিকে মন রাখিবার আর কাহারো ক্ষমতা রহিল না। পরস্পরে বসিয়া, যে কথাবার্তা হইত, তাহার অন্য কিছু উদ্দেশ্য আছে বলিয়া কেহই জানিত না; কেবল পরমহংস মশাই-এর সম্বন্ধে কথাবার্তা কহাই উদ্দেশ্য। এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে রাত্রি অধিক হইয়া যাইত; কিন্তু, একে অপরকে ছাড়িতে পারিত না। রাত্রিতে এক জন অপরকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে যাইত, আবার সে ব্যক্তি নিজ বাড়ির দরজা হইতে ফিরিয়া তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিত। এইরূপ, অধিক

রাত্রি বা প্রায় সমস্ত রাত্রি পর্যন্ত উভয়ে পায়চারি করিত, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। প্রত্যেক লোক বোধ করিত যে, পরমহংস-মশাই-মিশ্রিত-আটা লাগানো রহিয়াছে বলিয়া কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। এ বিষয় কাহারো সন্দেহ করিবার কিছুই নাই; ইহা আমরা স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি।

এইরূপ আচ্ছন্নভাবে থাকাতে কাজ-কর্মের কোনো ব্যাঘাত হইত না, বরং অল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুল কাজ হইত। ইহাকে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া বলা যায় না; অজ্ঞাতসারে ভাব-সমাধি হওয়া বলা যায়। জপ-ধ্যান করিয়া যেরূপ উচ্চ অবস্থায় উঠা যায়, অজ্ঞাতসারে তাহাই হইত। পরমহংস মশাই যে কিরূপ, ও কত দূর তাঁহার সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর বিকিরণ করিতে পারিতেন, ইহা তাহারই নিদর্শন। অবশ্য, ইহা জানিতে হইবে যে, সব সময় তিনি নিজ দেহ হইতে এই শক্তি বাহির করিতেন না। কারণ, অধিকাংশ সময়েই তিনি সাধারণ লোকের মতো সাধারণভাবেই থাকিতেন; সাধারণ লোক হইতে মাত্র কিছু তফাৎ এই যা। কিন্তু, তিনি নিজে যখন উচ্চ স্তরে উঠিতেন, এবং যখন তিনি ইচ্ছা করিতেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে এই আভা বা শক্তি বাহির হইত।

বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ উচ্চ অবস্থায় অবস্থিতিকে, আনন্দময় লোকে অবস্থান বলা হইয়াছে; ইহা ভাবলোক ও জ্ঞানলোকে অবস্থানের বহু ঊর্ধ্বে বা উচ্চে। এই অবস্থাটি পাওয়া অতীব দুর্লভ। বোধ হয়, সাধারণ লোক নিজের চেষ্টায় এই অবস্থা জীবনে দু-চার বার পাইতে পারে মাত্র। কিন্তু, পরমহংস মশাই-এর শরীর হইতে যখন এই শক্তি বাহির হইত, তখন সকলে অযাচিতভাবে এই অতীব দুর্লভ অবস্থা লাভ করিত।

নরেন্দ্রনাথ যখন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম গিয়াছিল, তখন পরমহংস মশাই হঠাৎ এই শক্তি নরেন্দ্রনাথের উপর প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের ভিতরটা তখন দেহ ছাড়িয়া যেন কোথায় উঠিয়া যাইতে লাগিল। রামদাদার বাড়িতে পরমহংস মশাই-এর এই ভাব-বিকাশ বা শক্তি-বিকাশ, যাহাকে বলে চকিতের ভিতর বিদেহ বা অশরীরী করিয়া দেওয়া, অনেক সময় অনুভব করিতাম। পরমহংস মশাইকে দেখিয়াছেন এমন লোক যদি আজও জীবিত থাকেন তো, তাঁহারা এ বিষয়টি স্মরণ করিতে ও অনুভব করিতে পারিবেন।

স্যামুএল বিল-এর গ্রন্থে আছে যে, এক দিন, প্রাতঃকালে গৌতম রাজগৃহে যাইয়া পথে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গৌতমকে দেখিয়া আশ-পাশের লোকজন সকলেই অবাক্ হইয়া গেল; তাহারা নিজ নিজ কাজ-কর্ম ভুলিয়া গিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাওয়া-চাহি করিতে লাগিল। দাঁড়িপাল্লা লইয়া যাহারা জিনিস বিক্রয় করিতেছিল, পাল্লাটি তাহাদের হাতেই স্থির হইয়া রহিল; যাহারা পয়সা গণিয়া লইতেছিল, পয়সা তাহাদের হাতেই রহিয়া গেল; যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহাদের পাত্র হাতেই অচল হইয়া রহিল। স্ত্রীলোকেরা দরজার ফাঁক দিয়া, জানালা হইতে উঁকি মারিয়া, কেহ বা বারাণ্ডা হইতে, কেহ বা ছাদ হইতে এই অজ্ঞাত লোকটির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চাহিয়া রহিল; কেহ কেহ বলিতে লাগিল, ইনি নিশ্চয় দেবরাজ; কেহ বলিল, ইনি শক্র, নরকায় ধারণ করিয়া পৃথ্বীতলে ভ্রমণ করিতেছেন; কেহ কেহ বা,—সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, ইত্যাদি আখ্যা দিল। ওদিকে রাজা সেনিয় বিম্বসার† তোরণ হইতে অনিমেষ নেত্রে

† 'বিম্বসার', পালি সাহিত্যে—'সেনিয় বিম্বিসার', এবং জৈন আগম গ্রন্থে—'সেণিয়'

যুবা সন্ন্যাসীকে দেখিতে দেখিতে মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই যেমন একটি আকর্ষণী শক্তির উপাখ্যান আছে, পরমহংস মশাইকে আমরাও ঠিক এইরূপ দেখিয়াছিলাম। গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের এইরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল। একটি উক্তি আছে: There is a divinity that hedges round a saint, অর্থাৎ, সিদ্ধ মহাপুরুষদিগকে একটি দেবশক্তি আবরিত করিয়া রাখে। অপর মহাপুরুষগণের বিষয় গ্রন্থে পড়িয়াছি মাত্র, কিন্তু পরমহংস মশাই-এর জীবনে

(শ্রেণিক) অথবা 'ভিম্ভসার' (=বিম্বসার) নামে সুপরিচিত। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'-এ তিনি 'শ্রেণ্য বিম্বিসার' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার শ্বেত পতাকা ছিল বলিয়া পালি 'থেরগাথা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি 'পণ্ডরকেতু' (=পাণ্ডরকেতু, শ্বেতকেতু) আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন।

পালি অর্থকথাকারগণের মতে, (১) 'সেনিয়' বিম্বিসারের খ্যাতি মাত্র; (২) বিম্বিসার সেনিয়-গোত্রীয়; অথবা (৩) তাঁহার বৃহৎ সৈন্যবল ছিল বলিয়া তাঁহাকে সেনিয় আখ্যা প্রদত্ত হয়। কিন্তু সংস্কৃত 'শ্রেণ্য' বা 'শ্রেণিক' পদ হইতে এরূপ কোনো কল্পনা সিদ্ধ হয় না।

বিম্বিসার নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধেও চারি প্রকার মত বৌদ্ধ সাহিত্যে দৃষ্ট হয়: (১) 'বিম্বি' অর্থে সোনা, এবং তাঁহার দেহকান্তি সোনার ন্যায় দীপ্তিমান ছিল বলিয়া তাঁহার নাম হয় বিম্বিসার; (২) মাতার নাম 'বিম্বী', এবং বিম্বীর সার বা হৃদয়ের ধন বলিয়া তাঁহার নামকরণ হয় বিম্বিসার, অথচ তাঁহার পূর্ব ব্যক্তিগত নাম ছিল 'মহাপদ্ম' (রক্‌হিল প্রণীত 'লাইফ অভ্ দি বুদ্ধ' দ্রঃ); (৩) তিনি দেখিতে 'বিম্ব' বা উদীয়মান সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন, ইহাই তাঁহার বিম্বিসার নামের বিশেষত্ব; এবং (৪) বিম্বিসার একটি অর্থহীন ব্যক্তিগত নাম মাত্র।

অমরকোষের মতে, 'বিম্ব' শব্দে সূর্যের দেহ অথবা চন্দ্রের দেহ বুঝায়। বিম্বিসার নামের পূর্বোক্ত তৃতীয় ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে, বিম্বিসারের পরিবর্তে বিম্বসার নামই সার্থক হয়। এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'ললিত-বিস্তরঃ' গ্রন্থে বিম্বিসার এবং বিম্বসার—উভয়বিধ পাঠই পাওয়া যায়। বলা অনাবশ্যক যে, জৈন ভিম্ভসার আখ্যা বিম্বসার নামেরই পরিপোষক। জৈন ভাষ্যকারগণের মতে, 'ভাসন্ত দীপ্যমান' অর্থে ভিম্ভসার।

ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দু-একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

তখনকার দিনে এত ডাক্তারখানা ছিল না। শিমলা অঞ্চলে 'বাঘওয়ালা ডাক্তারখানা'-ই[১] এক প্রধান ডাক্তারখানা ছিল। এক ব্যক্তির বাইশ বৎসরের একটি ছেলের টাইফয়েড অসুখ করিয়াছিল। টাইফয়েড রোগে তখন লোকে বড়-একটা বাঁচিত না; লোকটি প্রেসক্রিপসন লইয়া, হন্তদন্ত হইয়া, ডাক্তারখানায় ওষুধ আনিতে যাইতেছিল। লোকটিকে দেখিতে কালোপানা; দোহারা, লম্বা-চওড়া চেহারা; বয়স, পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ হইবে। লোকটি আমাদের পাড়ার নয়। আমরা তাহাকে চিনিতাম, কিন্তু তাহার সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয় ছিল না। বোধ হয়, তাহার বাড়ি ছিল জোড়াসাঁকো অঞ্চলে। সড়ক দিয়া যাইলে ওষুধ আনিতে অনেক দেরি হইবে, সেইজন্য, সে সিংহীদের পুকুর-পাড় দিয়া, রামদাদার বাড়ির সম্মুখের গলি দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। রামদাদার বাড়ির দরজায় আসিয়া সে দেখিল যে, রাস্তায় বেঞ্চি পাতিয়া অনেক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, যেন বাড়িতে লোকজন খাওয়ানো হইবে। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এখানে কি গো?" উপস্থিত এক জন বলিলেন, "এখানে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই এসেছেন।" লোকটি বলিল, "কোন্‌টি?" তখন তাহাকে বলা হইল যে, গালিচার উপর যিনি বসিয়া আছেন, তিনিই হইতেছেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই। লোকটি রাস্তা হইতে জানালার গরাদের ভিতর দিয়া খানিকক্ষণ উঁকি মারিয়া দেখিল। ঠিক সেই সময় পরমহংস মশাই-এর গা হইতে আকর্ষণী শক্তি বাহির হওয়াতে, যেমনই তাহা অচেনা

১ এই ডাক্তারখানায় একটি পুরিত ব্যাঘ্র (Stuffed tiger) থাকিত, এইজন্য, সাধারণে ইহাকে বাঘওয়ালা ডাক্তারখানা বলিত।

লোকটির গায়ে লাগিল, অমনি সে অভিভূত হইয়া পড়িল। ভিতরে বসিবার আর জায়গা ছিল না, কাজেই, সেই লোকটি বাহিরে বসিয়া রহিল। তাহার পর, সকলে যখন তেতলায় খাইতে গেল, সেও দ্বিধা না করিয়া খাইতে গেল। আহার করিয়া সকলে নামিয়া আসিল। রাত্রে যখন পরমহংস মশাই ফিরিয়া গেলেন এবং সকলে যে-যার বাড়িতে যাইতে লাগিল, তখন তাহার হুঁশ হইল যে, রাত্রি এগারোটা সাড়ে-এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে, তাহাকে ওষুধ আনিতে যাইতে হইবে, ডাক্তারখানা হয়তো বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বাড়ির লোকেরাই বা কি ভাবিবে!

পাড়ার একটি যুবক মদ-ভাঙ খাইয়া বেড়াইত। সে ওভারসীয়ার-এর কাজ করিত। নগদ টাকা যাহা পাইত, তাহাতে সে মদ খাইত। রামদাদা এক দিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আরে, তুই তো মদ খেয়ে বেড়াস, তোর চাট জোটে কি?" সে মাতাল লোক, সরলপ্রাণে বলিল, "রামদাদা, বলতে কি, চাটের পয়সা জোটে না, শুধু মদ খেয়ে বেড়াই।" রামদাদা উপহাসের ছলে তাহাকে বলিলেন, "তুই আজ সন্ধ্যের সময় আসিস। তোকে লুচি-আলুর-দমের চাট খাওয়াবো।" মাতাল এই শুনিয়া তো ভারি খুশি। কাছেই তাহার বাড়ি। সন্ধ্যার সময় আসিয়া বাহিরের বেঞ্চির কাছটিতে বসিয়া রহিল, এবং খাতিরে, ঘরের ভিতর গিয়া পরমহংস মশাইকে একটা প্রণামও করিয়া আসিল; আর, ক্রমাগত বকিতে লাগিল, "লুচি-আলুর-দমের চাট কখন্ দেবে? লুচি-আলুর-দমের চাট কখন্ দেবে?" তাহার পর, সকলের সঙ্গে সেও উপরে গিয়া খাইয়া আসিল। কিন্তু, সে এমন চাট খাইয়া আসিল যে, চিরজীবনের মত চাট খাইল! সে যে সময় আসিয়াছিল, সেই সময় পরমহংস

মশাই-এর দেহ হইতে আকর্ষণী শক্তিটি বাহির হইয়াছিল। শক্তিটি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পরে, সে ক্রমাগত খবর লইত, "পরমহংস মশাই আবার কবে আসবেন?" যদিও তাহার মদ খাওয়ার অভ্যাসটা কিছু দিন রহিল, কিন্তু, ধীরে ধীরে, তাহার ভিতরটা বদলাইয়া যাইতে লাগিল।

এই লোকটি নাগপুরে পরে চাকরি করিতে গিয়াছিল। ক-এক বৎসর সে শিমলায় ছিল না। এক বার নাগপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল যে, পাড়ায় পুরানো লোক আর বড় কেহ নাই; অনেকেই মারা গিয়াছে। সে তাহার আত্মীয়দের সহিত দেখা করিয়া আসিয়া সকাল-বিকাল আমার কাছে বসিয়া থাকিত, আর বলিত, "ভাই, তাঁর কথা বল, আর জগতে কিছু ভাল লাগে না। আমি মাতাল লোক ছিলুম, লুচি-আলুর-দমের চাট খেতে গিয়েছিলুম; কিন্তু, তিনি কী করে দিলেন? তাঁকে ছাড়া আর কিছু মনে আসে না। হায়, এমন অমূল্য রতন হাতে পেয়ে তখন কিছু বুঝি নি, লুচি-আলুর-দমই শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলুম!"

এই লোকটির নাম বিহারী ঘোষ। পরে, সে নাকি নাগপুরে একটি ঠাকুরঘর করিয়াছিল।

ভাগবত-কথা সাঙ্গে

রামদাদার বাড়িতে ক-এক মাস ভাগবত-পাঠ হইয়াছিল। রামদাদা ভাগবত-কথা সাঙ্গের পর, এক দিন, উৎসব করিয়াছিলেন। সময়টা বোধ হয়, বর্ষার শেষে, এক শনিবারে। প্রথম অবস্থায় রামদাদার মাহিনা অল্প ছিল। এই উৎসবের সময় রামদাদার দুই শত টাকা মাহিনা হইয়াছিল। উৎসবে বেশ লোক হইয়াছিল। পরমহংস মশাই, বেলা সাড়ে-তিনটা

কি চারটার সময় রামদাদার বাড়িতে আসিলেন। তিনি দক্ষিণ দিকের উঠানটির পূর্ব দিকের ছোট দালানটিতে গালিচার উপর বসিলেন। উঠানে জাজিম পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই আসিয়া জাজিমের উপর বসিলেন। তাঁহার পরনে সাদা ধুতি; গায়ে একটি সাদা পিরান ও একখানি উড়ুনি। তখন তাঁহার জোয়ান বয়স, চল্লিশ কি বেয়াল্লিশ বৎসর হইবে। তিনি তখন নব-বিধান হইতে সাধারণ-সমাজে চলিয়া আসিয়াছেন। সুরেশ মিত্তির অফিস হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া পরমহংস মশাইকে দেখিতে আসিলেন। পরমহংস মশাই ও গোস্বামী মশাই নানা প্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। কি কথা হইয়াছিল, আমার কিছুই স্মরণ নাই। তবে, এইমাত্র স্মৃতি আছে যে, সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পরমহংস মশাই-এর কথা শুনিতে লাগিলেন। তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদ কিছুই ছিল না; সকলেই একমনে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, কী একটি শক্তি আসিয়া সকলকে অভিভূত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতে লাগিল।

আমি বার বার এই কথাই বলিতেছি যে, পরমহংস মশাই-এর কথাবার্তা অপেক্ষা তাঁহার ভিতর হইতে যে একটি শক্তি বাহির হইত, তাহা অনেক উচ্চ স্তরের বস্তু। অল্প সময়ের ভিতর, ভাষা, শব্দ, উপস্থিত ব্যক্তি ও স্থান—এই সকল চিন্তা দূর হইয়া যাইত; মনটা যেন অন্য কোথায় চলিয়া যাইত; ঠিক যেন তিনি কেন্দ্র বা বিন্দু, এবং শ্রোতৃবর্গ পরিধি। এইজন্য, তাঁহার কথাবার্তা তত কিছু মনে থাকিত না, মাত্র একটি আনন্দের স্মৃতি থাকিত। ইহা চাপল্যের ভাব নয় বা উল্লাসের ভাবও নয়; অতি গম্ভীর, স্নিগ্ধ ও প্রাণস্পর্শী একটি ভাব বা শক্তি, যাহা

তিনি ইচ্ছামাত্র নিজ দেহ হইতে বিকিরণ করিতে পারিতেন। এই ভাব বা শক্তির তুলনায় আনুষঙ্গিক ব্যাপারসমূহ অতি তুচ্ছ।

দেখিয়াছি যে, সাধারণ অবস্থায় পরমহংস মশাই একটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত ব্যক্তির মতো; কথাবার্তার ভাষা কলিকাতার মতো নয়, পাড়াগেঁয়ে লোকের মতো, এমন কি, দূষণীয়। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের বিগর্হিত অনেক শব্দ তিনি ব্যবহার করিতেন, এবং তাঁহার আচার-ব্যবহারেও শিক্ষিত সমাজের বিগর্হিত ভাব বিদ্যমান থাকিত। মনে হইত, একটা বোকা-হাবা লোক, জগতের কিছুই বোঝে না। কিন্তু, তিনি যখন মনটা উপরে তুলিতেন, তাহার খানিকক্ষণ পরে, তাঁহার মুখের ভাব, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গী ও চেহারা এমন পরিবর্তিত হইয়া যাইত ও তাঁহার শরীর হইতে এমন একটি শক্তি বাহির হইত যে, বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যাইত—সকলে এক অতি মহান্ পুরুষের কাছে বসিয়া আছি। নিজেদের অপেক্ষা তিনি যে কত উচ্চ স্তরের লোক, তাহা কিছুই নির্ণয় করা যাইত না। তিনি যে ধীশক্তিসম্পন্ন এক অদ্ভুত পণ্ডিত পুরুষ —ইহা নয়; ইহারও উচ্চে—প্রচলিত সকল প্রকার ভাব ও চিন্তার বহু উচ্চে তিনি উঠিতেন; অন্য এক প্রকার লোক তিনি হইয়া যাইতেন। জগৎকে বা সৃষ্টিকে তিনি যে এক নূতন দিক্ হইতে দেখিতেছেন, এবং যাহা দেখিতেছেন, তাহা যে নিশ্চিত ও দৃঢ়, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইত। বলা বাহুল্য, তাঁহার চিন্তাশক্তি ও অপরের চিন্তাশক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। সাধারণ লোক পুস্তকাদি পড়িয়া থাকে ও তর্ক-যুক্তি ইত্যাদি দিয়া সাধারণভাবে চিন্তা করে এবং কথার মারপ্যাঁচ করিয়া থাকে। ইহাতে শ্রোতার বা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরক্তিভাব আসে। ইহাই হইল সাধারণ লোকের

কথাবার্তা কহিবার তাৎপর্য। কিন্তু দেখিতাম যে, পরমহংস মশাই, অ-চিন্তিতভাবে, জগতের ব্যাপারসমূহ অন্য দিক্ হইতে দেখিতেন, যাহা পূর্বে কাহারো দৃষ্টিগোচর হয় নাই। জগতের নানা সম্পর্ক, চিন্তা, ভাব ও কারণ—এই সকল তিনি নূতন ধরনে দেখিতেন, এবং সেইগুলি তিনি শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিতেন; শুধু বুঝাইয়া দিতেন তাহা নয়, স্পষ্ট ধারণা করাইয়া দিতেন, এবং সেইগুলি যে সত্য, তাহা বিনা তর্ক-যুক্তিতে প্রমাণ করাইয়া দিতেন; ভাবগুলি ঠিক যেন রূপ ধারণ করিত। সকলে যে এক অতীন্দ্রিয় অবস্থা লাভ করিত, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিত। তিনি যেন নিজের শক্তি দিয়া সকলের মনকে ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইতেন, এবং জগৎটাকে এক নূতন দিক্ হইতে দেখাইতেন। এই ভাবটি আমি সর্বদাই অনুভব করিতাম। এইজন্য, কথাবার্তা বা আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহে কখনো মন দিতে পারিতাম না। বহু কষ্টে, ধ্যান-জপে যে অবস্থা পাওয়া যায়, তাহা যেন তাঁহার পক্ষে নিম্ন স্তরের ক্ষেত্র বা স্বাভাবিক অবস্থা ছিল। এইজন্য, তিনি সর্বদাই বলিতেন, "অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ"। খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাব কিছুই নাই, সমস্তই একীভূত।

পরমহংস মশাই

পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে আসিলে প্রথমে যেমন জন চল্লিশ লোক হইত, এবং রামদাদা তাঁহাকে বাড়িতে লইয়া আসার জন্য সশঙ্ক থাকিতেন, পাছে কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা বা উপহাস করে—ক্রমে ক্রমে, সেই ভাব চলিয়া যাইল। পরমহংস মশাইকে সকল লোকে শ্রদ্ধা করুক বা না করুক, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব তাহাদের আর রহিল

না। লোকসংখ্যা আরো বাড়িতে লাগিল; পঞ্চাশ হইতে এক শ', দেড় শ', এমন কি, তিন শ' পর্যন্ত লোক আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে, অনেকেই তাঁহাকে একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস' বা 'রামডাক্তারের গুরু' না বলিয়া, 'পরমহংস মশাই' বলিতে লাগিল। এমন কি, পরমহংস মশাইকে যে ব্যক্তি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত না, তাহার কাছেও যদি কেহ পরমহংস মশাই-এর সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিত, তাহা হইলে সে চটিয়া যাইত। ব্রাহ্মণেরা, প্রথমে, প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা-ভাব দেখাইতেন; ক্রমে, তাঁহারা প্রকাশ্যে আর সেরূপ ভাব দেখাইতেন না; তবে, সমাজের ভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। কারণ, ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ হইয়া তাঁহারা কৈবর্তদের পূজরীর সহিত কিরূপে একত্র বসিবেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। এই ছিল তাঁহাদের মনের ভাব।

পরমহংস মশাই-এর প্রতি পাড়ার সকল লোকের পূর্বকার ভাব চলিয়া গিয়া, বেশ একটি শ্রদ্ধার ভাব আসিতে লাগিল। তিনি যেন পাড়ার লোক, নিজেদের লোক ও সকলের শ্রদ্ধেয়, আর, তাঁহার কাছে যাঁহারা যাইতেন, তাঁহারা সকলেই যে স্বগোষ্ঠীর লোক, এই ভাবটিও ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। এই স্বগোষ্ঠীর ভিতর বা আপনা-আপনির ভিতর পরস্পরের বাড়িতে খাওয়া চলিত। জাতাজাতির গোঁড়ামি আপনা-আপনির ভিতর কমিয়া যাইল। গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে আর একটি ভাব আসিল—যে ব্যক্তি পরমহংস মশাই-এর কাছে যায়, তাহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অজ্ঞাতসারে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে আসিলে, যাঁহারা সর্বদা সেখানে আসিতেন, তাঁহারা

তাঁহাকে বেশ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধা-ভক্তি যাঁহারা করিতেন না বা কোনো প্রকার চঞ্চলভাবের কথা কহিতেন, তাঁহাদের কাছ হইতে এই গোষ্ঠীর লোকেরা একটু তফাৎ থাকিতে লাগিলেন; এবং যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, তাঁহাদের সহিত বসিয়া কথাবার্তা কহিতেন। পরমহংস মশাইকে যাঁহারা রামদাদার বাড়িতে দেখিতে আসিতেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটি টানও আসিতে লাগিল। এমন একটি টান আসিল যে, পরস্পরকে দেখিতে বা পরমহংস মশাই-এর সম্বন্ধে তুটো কথা কহিতে সকলেই যেন আনন্দ পাইত। স্বগোষ্ঠীর সকলের মধ্যে পরমহংস মশাই-এর বিষয় কথাবার্তা হইত, এবং তিনি যে কথা বলিতেন, সেই কথাটির কি অর্থ ও কি তাৎপর্য—এই সকল বিষয় আলোচনা হইত। অপর কোনো কথাই সেই সময় হইত না; বা, কেহ অন্য কোনো কথা কহিতে পছন্দও করিত না। মোট কথা, তাঁহার নাম, তাঁহার প্রসঙ্গ, তাঁহার বাসস্থান, তাঁহার প্রিয় ব্যক্তি—এ সকলই যেন মধুর বলিয়া বোধ হইত। ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতাম যে, পণ্ডিত—মূর্খ, ধনী—দরিদ্র, এ সকল ভাব কিছুই থাকিত না। পরমহংস মশাই এত উচ্চ অবস্থা হইতে কথা কহিতেন যে, পণ্ডিত—মূর্খ হইত, মূর্খ—পণ্ডিত হইত, ধনী—গরিব হইত এবং গরিব—ধনী হইত। এইজন্যই, পুনঃ-পুনঃ বলিতেছি যে, তাঁহার ভিতর হইতে কী একটি শক্তি বাহির হইয়া সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিত, সকলের মধ্যে এক নূতন প্রাণের সৃষ্টি করিত, এবং সকলের চিন্তাধারা ও ভাবস্রোত অন্য প্রকার করিয়া দিত; এমন কি, নবীনতা ও প্রবীণতার পার্থক্যবোধও কিছু থাকিত না; যেন, অশথ গাছ ও দূর্বা-ঘাস একই হইয়া যাইত!

গঙ্গার ঘাটে কেশববাবুর বক্তৃতা

হৃদু মুখুজ্যের[১] কাছে এক দিন শুনিয়াছিলাম যে, গরমিকালে, এক দিন শনিবারে, কেশববাবু ষ্টীমার করিয়া স-দলবলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তিনি তো, এত জনসমাগম হইয়াছে দেখিয়া, খুব আনন্দিত হইলেন। তাহার পর তিনি অনুনয় করায়, কেশববাবু গঙ্গার ধারে বড় ঘাটটিতে গিয়া, গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া, বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। হৃদু মুখুজ্যে বলিয়াছিলেন, "কেশববাবুর কী বক্তৃতার ক্ষমতা, মুখ দিয়ে যেন মল্লিকে ফুল বেরুতে লাগলো! অনর্গল তিনি বলতে লাগলেন। কেশববাবু টাউন হলে লিক্‌চার দিয়ে থাকেন, সে তো কখনো শোনা হয় নি; সেজন্য, কেশববাবুর লিক্‌চার শোনবার এত আগ্রহ হয়েছিল।"

পরমহংস মশাইও বক্তৃতা শুনিতেছিলেন, কিন্তু, খানিকক্ষণ পরেই তিনি বিরক্ত হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া যাইলেন। পরমহংস মশাইকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কেশবাবু ভাবিলেন যে, তাহা হইলে, বোধ হয়, বক্তৃতায় কোনো ক্রটি হইয়াছে। কিন্তু, অন্যান্য শ্রোতারা বলিতে লাগিল, "লোকটা অশিক্ষিত; মুক্‌খু, কোনো-কিছু বোঝে না, তাই চলে গেল।"

কেশববাবু বক্তৃতা শেষ করিয়া পরমহংস মশাই-এর কাছে আসিলেন। সেখানে কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় কেশব-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই, কি ক্রটি হয়েছে?" পরমহংস মশাই বলিলেন, "তুমি বললেঃ ভগবান্‌, তুমি সমীরণ দিয়েছ, তরু-গুল্ম দিয়েছ।—এ সকল তো বিভূতির কথা। এ সব নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? যদি এ সব বিভূতি তিনি নাই দিতেন, তা হলেও কি তিনি ভগবান্‌ হতেন না?

১ শ্রীযুত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয়

বড়মানুষ হলেই কি তাঁকে বাপ বলবে; যদি তিনি গরিব হতেন, তা হলে কি তাঁকে বাপ বলবে না?" এইরূপ, 'গুণ' ও 'বস্তু'-র কথা, বিভূতি বা ঐশ্বর্যের অতীত হইলেন 'ব্রহ্ম',—এই সকল কথা হইতে লাগিল।

পর দিন, রবিবার, শিমলাতে এই কথাটি রটিয়া যাইল। তখন এত খবরের কাগজ ছিল না, সকল সংবাদ মুখে মুখে আসিত। বেলা নয়টা হইতে অনেক লোক গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটে আসিয়া জমা হইতে লাগিল, আর, উন্মত্ত হইয়া এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল; কারণ, এই ভাবের কথা তখন কাহারো জানা ছিল না। আমাদের তখনকার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান ছিল—কথকের মুখে কিছু কথা শুনিয়া, আর, বাইবেলের কথা শুনিয়া; ইহার বাহিরের কিছু কথা আমাদের জানা ছিল না, কেহ ভাবেও নাই। বিভূতি ও ঐশ্বর্যের উপর যে কিছু আছে, তখনকার দিনে এ কথাটি নূতন কথা। অবশ্য, কেহই তখনো পর্যন্ত ইহার বিশেষ তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই; তবে, সকলেই কেবল বলিতে লাগিল, "বড়মানুষ হলেই কি বাপ হবে, আর, গরিব হলে কি বাপ হবে না?" কথাটি নূতন হওয়ায় শিমলাতে লোকের ভিতর এইরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। এখনকার দিনে এরূপ কথা খুব বড় কথা নয়, কিন্তু তখনকার দিনে, ইহা অতি আশ্চর্যের কথা। আর, সেই সঙ্গে একটি কথা উঠিল, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই কেশব সেনের মাথা ভেঙে দিয়েছেন। কেশববাবু আর মাথা তুলে কথা কইতে পারেন না।" বেলা এগারোটা সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত লোকেরা রাস্তায় জটলা করিয়া মত্ত হইয়া এই সকল কথাই বার বার বলাবলি করিতে লাগিল। রবিবারের সকালবেলা বলিয়া জটলা কিছু বেশি হইয়াছিল, বিশ-পঁচিশ জন লোক হইবে।

শিমলার লোকেরা কিছু দিন পূর্বে যে ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করিত, অশিক্ষিত ও বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিত, এখন তাঁহারই এই সব কথা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরমহংস মশাইকে যাহারা উপেক্ষা করিত এবং সামান্য লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করিত না, তাহারা সেদিন হইতে পরমহংস মশাই-এর প্রতি নিজেদের মনের ভাবগতিক ফিরাইল। কেশববাবুর যে একছত্র প্রতিপত্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। এই দিন হইতে পরমহংস মশাই-এর প্রতি শিমলার লোকের একটু বিশেষ শ্রদ্ধা আসিল, এবং তিনি একজন বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন।

পরমহংস মশাই-এর প্রভাবে সমাজ

পূর্বে তরকারিতে নুন দেওয়া হইত না। আলুনী তরকারি হইত এবং পাতে পাতে নুন দেওয়া হইত। কিন্তু, রামদাদার বাড়িতে নুন দেওয়া তরকারি চলিত এবং সকল শ্রেণীর ও সকল বর্ণের লোকই একসঙ্গে আহার করিত। অপর স্থানে লুচি ও নিরামিষ তরকারি হইলেও সকলে একসঙ্গে আহার করিত না। কিন্তু, রামদাদার বাড়িতে যখন পরমহংস মশাই আসিতেন, তখন সকল বর্ণের লোকই একসঙ্গে আহার করিতে বসিত। তখনকার দিনে এইটি বড় নূতন ব্যাপার; কারণ, তখনকার দিনে খাওয়া-দাওয়া একটা বিষম সমস্যার বিষয় ছিল। সামাজিক ব্যাপারে এ সব কিছু চলিত না। এ বিষয়ে পরমহংস মশাই এক বার বলিয়াছিলেন যে, ভক্তের ভিতর জাত নাই, যাহারা ভক্ত, তাহারা একসঙ্গে আহার করিতে পারে।

আরো দেখিতাম যে, নিমন্ত্রণ না করিলেও অনেকে আসিতেন ও আগ্রহ করিয়া আহার করিয়া যাইতেন; এমন

কি, বৃদ্ধ লোকেরাও পরমহংস মশাই আসিবেন শুনিলে, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া আহারও করিয়া যাইতেন। পরমহংস মশাই-এর এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, অনিমন্ত্রিত হইয়াও, কেহ দ্বিধা না করিয়া, সকল লোকের সহিত একসঙ্গে আহার করিত। অন্য প্রকার আহার না করিলেও, লুচি-তরকারি খাইত। এইরূপ খাওয়া শিমলাতে তো ছিলই না, এমন কি, কলিকাতার অন্য কোনো স্থানেও ছিল না। কলিকাতায়, তখনকার দিনে, ইহাতে একটা মহা হই-চই পড়িয়া গিয়াছিল।

এইরূপে ধীরে ধীরে, অজ্ঞাতসারে, পরমহংস মশাই তাঁহার কাজ করিতে লাগিলেন; কোনো তর্ক-যুক্তি বা হুকুম চালাইয়া নয়, কিন্তু, তিনি সকলের মন এত উচ্চ স্তরে তুলিয়া দিতেন যে, সামাজিক বন্ধন, খুঁটিনাটি—এ সব কিছুই মনে থাকিত না। এক অসীম, অনন্ত, মহা উচ্চ স্থানে তিনি মনটাকে তুলিয়া দিতেন, যেখানে এরূপ সামাজিক ভাব কিছুই থাকিত না, গোঁড়ামির ভাব একেবারেই থাকিত না।

আমরা প্রণাম করার প্রথাকে কু-সংস্কার বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমরা বলিতাম, "ওটা ডোলের প্রথা, ওটার কোনো আবশ্যক নেই।" পরমহংস মশাই-এর সংস্পর্শে আসিয়া আমরা পরস্পরকে দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিতে শিখিলাম। প্রথম প্রথম, প্রকাশ্যে যদিও ঐভাবে প্রণাম করিতে বাধ-বাধ ঠেকিত, কিন্তু, ধীরে ধীরে, আমরা পরস্পরকে প্রণাম করিতে শিখিলাম। পরমহংস মশাই নিজে প্রণাম করিয়া সকলকে প্রণাম করিতে শিখাইলেন। এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবুর উপাখ্যানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গিরিশবাবু এক দিন বৈকালবেলা, বাগবাজার বোসপাড়ার গলির মোড়ে রকের উপর বসিয়াছিলেন, এমন সময়, পরমহংস

মশাই গাড়ি করিয়া সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। গিরিশবাবু তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রণাম করিবার পূর্বেই পরমহংস মশাই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবু আবার প্রণাম করিতে যাইলে পরমহংস মশাই পুনরায় তাঁহার পূর্বে প্রণাম করিলেন। বারংবার এইরূপ করায়, গিরিশবাবু প্রণাম করিতে ক্ষান্ত হইলেন। পরমহংস মশাই কিন্তু নিবৃত্ত না হইয়া, তাহার পরেও গিরিশবাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবু তখন মনে ভাবিতে লাগিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সঙ্গে আর প্রণাম করা চলে না। ওটা পাগলা বামুন, ওর ঘাড় ব্যথা হয় না।"

এই ঘটনাটি উল্লেখ করিবার সময় গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, "রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে বাঁশির ধ্বনিতে জগৎ-জয় হয়েছিল, কিন্তু, রামকৃষ্ণ অবতারে প্রণাম-অস্ত্র দিয়ে জগৎ-জয় হবে।"

কথাপ্রসঙ্গে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, পূর্বে লোকজন মরিলে সহজে কেহ শবদাহ করিতে যাইত না। সকলেই দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইত। ডাকিলে কেহ সাড়া দিত না। সে এক বীভৎস ব্যাপার! নরেন্দ্রনাথ এই সময় অনেক শব কাঁধে লইয়া দাহ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু সে এই কাজ ঠিক যে পরমহংস মশাই-এর প্রভাবে করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। বাবা ইহাতে রাগ করিতেন। কতিপয় সঙ্গীকে লইয়াও নরেন্দ্রনাথ এইরূপ শবদাহ সমাধা করিত। বলিবামাত্রই, নরেন্দ্রনাথ ও তাহার কতিপয় সঙ্গী ভিন্ন বর্ণের লোকের শব দাহ করিতে যাইত। বিপন্নের সেবা করাই ছিল এইরূপ কাজ করার প্রধান উদ্দেশ্য। এইরূপ সামান্য শুরু হইতেই লোকের ভিতর ভাব বদলাইতে লাগিল। জাতাজাতির কঠোরতা এই সময় হইতেই কিঞ্চিৎ কমিতে

লাগিল। নরেন্দ্রনাথ হইল শিমলার এক বড়ঘরের ছেলে, যুবকদিগের অধিনেতা; এইজন্য, নরেন্দ্রনাথের উপর কেহ কথা কহিতে বিশেষ সাহস করিত না। এই সকল বিষয় এখন অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তখনকার দিনে এই সকল ব্যাপার অতি গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইত।

যাহা হউক, এইরূপ অনেকগুলি নূতন ভাব বা নূতন প্রথা অজ্ঞাতসারে আমাদের ভিতর আসিতে লাগিল। কিন্তু, তখনো আমরা প্রচলিত ভাবসমূহের ভিতরেই ছিলাম। এখন ইহা শুনিলে, অবশ্য, অনেকেই হাসিবেন, কিন্তু, আমি পুরানো কলিকাতার সমাজের কথা বলিতেছি, এবং এখনকার সমাজ কি করিয়া পরমহংস মশাই-এর প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার কথাই বলিতেছি। পরমহংস মশাই ভালবাসা দিয়া অজ্ঞাতসারে সমাজে এক চেতনা আনিয়া দিয়াছিলেন, তখন ইহা কাহারো চোখে ঠেকে নাই। অপরে তর্ক-যুক্তি ও বক্তৃতা দিয়া যে সকল সামাজিক প্রথা বা আচার-ব্যবহার পরিবর্তন করিতে পারেন নাই, পরমহংস মশাই, ধীরে ধীরে, নিজ প্রভাব দিয়া সেই সকল প্রথা বা আচার-ব্যবহার অনেক পরিমাণে পরিবর্তন করিয়াছিলেন; অথচ, যাঁহারা গোঁড়া লোক ছিলেন, তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারেন নাই।

প্রচারকার্যে রামদাদা

পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে মাঝে মাঝে আসিলে, সেখানে সকলে সমবেত হইতেন। অতি প্রথম সময়ে কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বলিবার জন্য এই সকল সামান্য কথার উল্লেখ করিতেছি। কারণ, সাধারণ লোক, উৎসবাদি করার জন্য, তখন বিদ্রূপ ও উপহাস করিত; কিন্তু, এই সকল

বিদ্রূপাদি সত্ত্বেও, রামদাদা পরমহংস মশাইকে বাড়িতে আনিয়া উৎসবাদি করিতেন। তিনি অপরের বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা—এ সব-কিছুতেই দৃক্‌পাত করিতেন না। প্রথম অবস্থায় রাম-দাদাকে অনেক বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া পরমহংস মশাই-এর সহিত মেলামেশা করিতে হইয়াছিল ও তাঁহাকে শিমলাতে আনিতে হইয়াছিল, যাহা করিতে অপর কেহ সাহস করেন নাই। এইজন্য, সকলেই রামদাদার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবেন। রামদাদাই নির্ভীক হইয়া প্রথমে এই সকল কাজ করিয়াছিলেন; ক্রমে, অপর সকলে এই সকল কাজে তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

রামদাদা সকল আলাপী লোকের বাড়িতে যাইয়া পরমহংস মশাই-এর কথা বলিয়া বেড়াইতে শুরু করিলেন, এবং তাঁহার ভাব ও ক্রিয়াকলাপ সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। রামদাদা হইলেন পরমহংস মশাই-এর প্রচারকার্যের এক বিশেষ মুখপাত্র। এমন কি, কথা উঠিয়াছিল, "রাম যে রকম করে ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে, এ রকম করলে তাঁর দেহ থাকবে না; আর, অত উচ্চ জিনিসকে হাটে-বাজারে দিলে লোকে নিতে পারবে না।" কিন্তু, রামদাদা এ সকল কথায় ভীত না হইয়া, সকলকে পরমহংস মশাই-এর কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং, মাঝে মাঝে, সঙ্গীদের লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে লাগিলেন। প্রথমকালে, রামদাদা পরমহংস মশাই-এর সর্বব্যাপী ভাবটি প্রচার করিবার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

কেশববাবুর শ্রদ্ধা-ভক্তি

এক দিন রামদাদার সহিত কেশববাবুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেশববাবু রামদাদাকে বলিলেন, "ওঁকে 'গ্লাস-কেস'-এর ভেতর

রেখে দূর থেকে দেখতে হয়, নাট-ঘাঁট করতে নেই।” —অর্থাৎ পরমহংস মশাই অতি উচ্চ অবস্থার লোক, তাঁহাকে হাটে-ঘাটে লইয়া গিয়া কথাবার্তা কহা ঠিক নয় বা তাঁহাকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক নয়। কারণ, সাধারণ লোকে তাঁহার অতি উচ্চ ভাবসকল বুঝিতে পারিবে না, হয়তো বা কেহ কিছু অবজ্ঞা করিবে, আর, তাহা হইলে, পরমহংস মশাইকে যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা লাগিবে। তিনি এত উচ্চ অবস্থার লোক যে, জগতে এ অবস্থার লোক অতি অল্পই আসিয়াছেন। সেইজন্য, তাঁহাকে সার্শির ভিতর রাখিয়া এক আশ্চর্য অদ্ভুত পুরুষ জ্ঞানে দূর হইতে দেখাই ভাল, অতি সসম্ভ্রমে দূর হইতেই তাঁহার কথা শুনিতে হয়।

পরমহংস মশাই-এর প্রতি কেশববাবুর যে কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, এবং তিনি যে তাঁহাকে কিরূপ উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে, কেশববাবুর প্রতি আমাদের কিরূপ আকর্ষণ ছিল এবং আমরা তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতাম, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

সম্ভবতঃ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, মাঘোৎসবের সময়, বিকালবেলা, কেশববাবু শেষ বার কোম্পানির বাগানে (বিডন গার্ডেন-এ) বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বাগানে তখন একটি ‘ব্যাণ্ড্‌ষ্ট্যাণ্ড’ বা বাজনা বাজাইবার জন্য একটি ইটের চবুতর বা মঞ্চ গাঁথা ছিল। কেশববাবু সেখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। আমরা অনেকেই বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। কেশববাবুর শেষ বাণী হইল—“মাতবি তো মেতে যা”। তাহার পর, তিনি সদলবলে কোম্পানির বাগান হইতে বিডন ষ্ট্রীট দিয়া

আসিতে লাগিলেন। আমরাও অনেকে পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলাম। দলটি পরে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল। কেশববাবু একটি দল লইয়া মাণিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া সুরেশ মিত্তিরের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিলেন। আমরা অনেকে তাঁহার দলে ছিলাম। কেশববাবুর হাতে রামদাদার তৈয়ার করানো সর্বধর্ম-চিহ্ন-দণ্ডটি[১] ছিল। সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে আসিলে, তিনি চিহ্ন-দণ্ডটি অপরের হাতে দিয়া খোলটি নিজের গলায় ঝুলাইয়া, উঠানে ও ঠাকুরদালানে কীর্তন গাহিতে লাগিলেন। গানটি হইল ঃ

"চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে।
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! বল, জয় দয়াময়!)
উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়।" ইঃ।

গানটি খুব জমিয়া গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ এই গানটি অনেক সময় গাহিত। সুরেশ মিত্তিরদের বাড়ি হইতে কেশববাবুর দল গানটি গাহিতে গাহিতে শিমলা ষ্ট্রীট দিয়া বড় রাস্তায়, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পৌঁছিল। এদিকে প্রতাপবাবু অপর দলটি লইয়া গান গাহিতে গাহিতে বড় রাস্তা দিয়া আসিলেন। প্রতাপবাবুর দলের গানটি আমার স্মরণ নাই। কেশববাবুর দলের গানটি খুব লোকরঞ্জক হইয়াছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূর পর্যন্ত গিয়া, রাত্রি হওয়ায়, বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পরমহংস মশাই-এর ভক্তদিগের সহিত কেশববাবুর কিরূপ সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং পরস্পরের প্রতি কিরূপ আকর্ষণ ছিল।

১ ইহাতে বিভিন্ন ধর্মের প্রতীক লাঞ্ছিত ছিল

কেশববাবুর প্রতি আমাদের কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, সে বিষয় আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই পর্যাপ্ত হইবে, যদিও ঘটনাটি খুব বিষাদময়।

কেশববাবু দেহরক্ষা করিলে পর, যখন সমারোহ করিয়া তাঁহার শব লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন আমরা সকলে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" উচ্চারণ করিতে করিতে আসিয়া সাধারণ-সমাজের সম্মুখে কৌচ নামাইলাম। একখানি কৌচে কেশববাবুর দেহ রাখা হইয়াছিল। শীতকাল, এইজন্য, গায়ে একখানি সাদা আলোয়ান দেওয়া হইয়াছিল। মুখ অনাবৃত ছিল, ঠিক যেন নিদ্রা যাইতেছেন—স্থির প্রশান্ত বদন, কোনো বিকৃত ভাব নাই, কেবল চোখে চশমা ছিল না, সাধারণ অবস্থা হইতে এই-যা তফাৎ। তাহার পর লোক বাড়িতে লাগিল। আমরা শব লইয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে করিতে, ধীরে ধীরে, বেথুন কলেজের পাশ দিয়া, বিডন ষ্ট্রীট হইয়া, বিডন গার্ডেন-এর কাছে যাইলাম। বেলা তখন সাড়ে-তিনটা কি চারটা হইবে। লোকসংখ্যা ও গাড়ির সংখ্যা আরো অধিক হইল। আমি নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু বরাবর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল এবং শবদাহ শেষ হইলে রাত্রিতে ফিরিয়াছিল।

রাজমোহন বসুর মাঘোৎসবে

রাজমোহন বসু নামে, নন্দকুমার চৌধুরী লেনে, কেশববাবুর একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি অতি সৎ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। এক বার মাঘোৎসবের ক-এক দিন পূর্বে তিনি নিজের বাড়িতে উৎসব করিলেন। কেশববাবুর সমাজের ভক্তেরা, তখনকার প্রথামতো, মাঘোৎসবের ক-এক দিন নিজ নিজ বাড়িতে একটি করিয়া নিশান তুলিতেন। এগারোই

মাঘ এই নিশান-ব্রত সমাপন হইত। রাজমোহন বসুর বাড়িতে জায়গা অল্প হওয়ায়, পাশের নন্দ চৌধুরীর বাড়িতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিকালবেলা রাখাল ও আমি সেখানে গিয়াছিলাম। উঠানে কীর্তন হইতেছিল ঃ

মন একবার হরি বল, হরি বল;
জলে হরি, থলে হরি, অনলে অনিলে হরি।" ইঃ।

কীর্তন সমাপ্ত হইলে, ঠাকুরদালানে, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়, নরেন্দ্রনাথ, উঠানে যেখানে কীর্তন হইতেছিল, তাহার এক পাশে গিয়া বসিল। খানিকক্ষণ পর, কেশববাবু ও পরমহংস মশাই আসিলেন। রাখাল ও নরেন্দ্রনাথ সেখানে রহিল। কি কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। জনসমাগম অধিক হইয়াছিল, কীর্তনাদিও খুব হইয়াছিল, এমন কি, পাড়াতে বেশ একটা হই-চই পড়িয়া গিয়াছিল।

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে

পরমহংস মশাই, এক দিন রবিবার সন্ধ্যার সময়, হঠাৎ, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপস্থিত হন। নরেন্দ্রনাথ, উপরকার বারাণ্ডায় যেখানে গান হইত, সেইখানে ছিল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া তাঁহার কাছে আসিল, এবং অনুনয় করিতে লাগিল, যেন তিনি সেখান হইতে চলিয়া যান। সাধারণ-সমাজের ভাব অন্য প্রকার হওয়ায়, নরেন্দ্রনাথ অতীব শঙ্কিত হইয়াছিল; এই ভাবিয়া, পাছে সমাজের লোকেরা তাঁহাকে কোনো প্রকার অসম্মান করেন। পরমহংস মশাই খানিকক্ষণ সেখানে রহিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পাশে পাশে ছিল। অবশেষে, পরমহংস মশাই চলিয়া আসেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ডাল-খিচুড়ি সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ।" —অর্থাৎ, পাঁচ-

মিশালী; সব জিনিস হইতেই কিছু কিছু লওয়া হইয়াছে, কোনোটাই পুরা মাত্রায় নয়।

শিমলার অন্যান্য বাড়িতে

পরমহংস মশাই শিমলাতে আসিলে, কখনো কখনো মনোমোহন-দাদার বাড়িতে অল্পক্ষণের জন্য বসিয়া, রামদাদার বাড়িতে যাইতেন। শিমলার অন্যান্য বাড়িতেও তাঁহার যাতায়াত ছিল।

এক দিন, বিকালবেলা, পরমহংস মশাই কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট দিয়া গাড়ি করিয়া যাইতেছিলেন। ডাক্তার বিহারী ভাতুড়ী দোতলায় বারাণ্ডাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে পরমহংস মশাইকে উপরে লইয়া যান, এবং তাঁহার সহিত খানিকক্ষণ কথাবার্তা কহেন। বোধ হয়, বিহারী ভাতুড়ীর সহিত পরমহংস মশাই-এর পূর্ব হইতেই জানাশুনা ছিল।

পরমহংস মশাই এক বার অষ্টমীর দিন, বেলা তিনটার সময়, গোসাঁইদের বাড়িতে দুর্গাপূজায় আসিলেন। সদর দরজায় ঢুকিতে ডান দিকে রাস্তার ধারের ঘরটিতে তিনি ক-এক মিনিট বসিয়াছিলেন। আমরা পাড়ার অনেক লোক সেখানে যাইলাম। মহেন্দ্র গোস্বামীর সহিত তিনি অনেক কথাবার্তা কহিলেন। সুরেশ মিত্তিরদের তখন নূতন গাড়ি কেনা হইয়াছিল, এইজন্য সুরেশ মিত্তির অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে নূতন গাড়িতে বসাইয়া নিজেদের বাড়িতে লইয়া গেলেন। আমরা আর যাই নাই। সুরেশ মিত্তিরদের বাড়ি হইতে সেদিন তিনি প্রতিমাদর্শনের জন্য অন্য কোথায় ক-একটি বাড়িতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

পরমহংস মশাই সুরেশ মিত্তিরদের বাড়িতে অনেক বার গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তিনি খানিকক্ষণ থাকিতেন। সুরেশ মিত্তিরের বাড়ির অপর সকলের ভাব অন্য প্রকার

হওয়ায়, তাঁহার বাড়িতে কখনো উৎসবাদি হয় নাই। পাছে, বাড়ির কেহ কিছু মনে করে, এইজন্য, সুরেশ মিত্তির অতি সংকোচে থাকিতেন এবং পরমহংস মশাইকে বাড়িতে লইয়া যাইয়া বিশেষ উৎসবাদি করিতে পারিতেন না। মিত্তিরদের বাড়ি যদিও আমাদের বাড়ির সংলগ্ন ছিল, কিন্তু, তখনকার দিনে তাঁহাদের বাড়িতে আমরা সর্বদা যাইতাম না; নিমন্ত্রণ করিলে, তবে যাইতাম। এইজন্য, সুরেশ মিত্তিরদের বাড়িতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি নিজে দেখি নাই, অপরের মুখে শুনিয়াছি।

এক দিন, অপরাহ্নে, পরমহংস মশাই সুরেশ মিত্তিরদের বাড়িতে যান। মিত্তিরদের বাড়ির কোনো ব্যক্তি উচ্চ সরকারী চাকরি করিতেন। তিনি পরমহংস মশাইকে দেখিয়াই মাতব্বরী চালে এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—সুরেশ মিত্তির পরমহংস মশাইকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন, মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে থাকেন, হাতে করে তাঁর জন্য কিছু জিনিসও নিয়ে যান; শিমলার রামডাক্তার, নরেন্দ্রনাথ ও আরো ক-একজন লোকও পরমহংস মশাই-এর অনুগত হয়েছে; পরমহংস মশাই ছোট ছেলেগুলিকে বখাচ্ছেন, নষ্ট করছেন, প্রভৃতি।—কথাগুলির তাৎপর্য এই যে, পরমহংস মশাই যেন একজন অকর্মণ্য লোক, কিছু কাজ-কর্ম করেন না, কেবল ছেলেগুলিকে খারাপ করিতেছেন। পরমহংস মশাই খানিকক্ষণ স্থির হইয়া কথাগুলি শুনিলেন, তাহার পর, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কী কাজ করো?" তিনি সরকারী চাকরি করিতেন, এইজন্য গর্বিতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি জগতের হিত করি।" কথাটি শুনিবামাত্রই পরমহংস মশাই অন্যবিধ হইয়া গেলেন, তাঁহার ভিতর হইতে যেন আর একটি ব্যক্তি আবির্ভূত হইল। তিনি বলিতে

শুরু করিলেন, "যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, তিনি কিছু বোঝেন না—তুমি সামান্য মানুষ, তুমি জগতের হিত করছ? স্রষ্টার চেয়ে তুমি বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ?" পরমহংস মশাই এই বলিয়া তাঁহাকে কঠোর তিরস্কার করিলেন। তিনি তখন অপ্রতিভ ও জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। পরমহংস মশাইকে এইরূপ কথা বলার জন্য লোকটির উপর সকলে বিরক্ত হইয়াছিল, কারণ, তখন তাঁহার প্রতি অজ্ঞাত-সারে সকলের বেশ একটি শ্রদ্ধার ভাব আসিতেছিল। পাড়াতে দিনকতক এই কথা বেশ চলিল; আমরা পরস্পর ঠাট্টা করিয়া বলিতাম, "কি হে, জগতের হিত করছ নাকি তুমি?" ক-এক মাস এইরূপ ঠাট্টা করা চলিয়াছিল।

স্বামী সারদানন্দ এক বার বলিয়াছিলেন যে, এক দিন, পূজার সময়, পরমহংস মশাই সুরেশ মিত্তিরদের বাড়ি গিয়াছিলেন। পরমহংস মশাইকে, ঠাকুরদালানে মারবেল পাথরের মেজের উপর আহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ঠাকুরদালানটি পশ্চিমমুখো। ঠাকুরদালানের দক্ষিণ দিকে দোতলা ঘর। মেয়েরা ঘরের জানালা হইতে পরমহংস মশাইকে দেখিতেছিলেন। পরমহংস মশাই-এর সম্মুখে অনেক লোক দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আহার করাইতেছিলেন। পরমহংস মশাই উপু হইয়া বসিয়া আহার করিতেছিলেন। এইরূপ বসিয়া আহার করাই তাঁহার দেশের প্রথা। আমরাও দেখিয়াছি যে, পরমহংস মশাই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আহার করিতেন না, হাঁটু দুইটি উঁচু করিয়া উপু হইয়া বসিয়া আহার করিতেন। তিনি আহার করিতেছেন ও বলিতেছেন যে, পূর্বে তিনি বড় বিভোর থাকিতেন, বাহ্যজ্ঞান কিছুই থাকিত না, কাপড় পরার কথা মনে থাকিত না, একেবারেই বে-ভুল, বে-এক্তিয়ার হইয়া থাকিতেন; কিন্তু

এখন তাঁহার সে ভাবটি কাটিয়া গিয়াছে, এখন তিনি কাপড় পরিয়া থাকেন এবং লোকজনের সম্মুখে বেশ সভ্যভব্য হইয়া বসিয়া থাকেন।—এই কথা শুনিয়া, উপস্থিত লোকসকল, ও, যে সকল মেয়েরা জানালা হইতে দেখিতেছিলেন, একটু হাসিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, ও-কথা ঠিক তো বটেই!" সকলে এই বলিয়া আমোদ করিয়া তাঁহাকে একটু উপহাস করিতে লাগিলেন। পরমহংস মশাই উপু হইয়া বসিয়া একটু একটু খাইতেছেন ও এইরূপ কথা চলিতেছে। সকলেই মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বাঁ-দিকের বগলের প্রতি হঠাৎ পরমহংস মশাই-এর দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখেন যে, কাপড়খানি বাঁ-বগলের ভিতর জড়ানো রহিয়াছে, আর, তিনি দিগ্‌বসন হইয়া বসিয়া আছেন। এইরূপ দেখিয়া, তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আরে ছ্যা! আমার ও-টা গেল না; কাপড় পরাটা আর মনে থাকে না!" এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কাপড়খানি লইয়া কোমরে জড়াইতে লাগিলেন। যে সকল পুরুষ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিলেন, মেয়েরাও জানালা হইতে হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরমহংস মশাই-এর ভাব এত সরল, স্নিগ্ধ ও উচ্চ ছিল যে, কাহারো মনে দ্বিধা বা সংকোচ না আসিয়া এক অতীন্দ্রিয় ভাব আসিল। কেহ কেহ বলিলেন, "মশাই, আপনার কাপড় পরবার দরকার নেই। আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকুন। আপনার কোনো দোষ হয় না।"

ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, একজন পুরুষ দিগ্‌বসন হইয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে কাহারো মনে দ্বিধা বা সংকোচ আসিতেছে না; এমন কি, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও কোনো দ্বিধা বা সংকোচ বা লজ্জার ভাব আসিতেছে না। ইহা উন্মত্ত ব্যক্তির ভাব নয়, ইহা বালকের ভাবও নয়;

ইহা এক অতীন্দ্রিয় ভাব, অন্য এক রাজ্যের ভাব—যাহাতে দ্বিধা বা সংকোচ ও দেহজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহা তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়; গভীর চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়। নিমেষের মধ্যেই তিনি সকলের মনকে কোথায় তুলিয়া লইয়া যাইলেন, যেখানে জগতের সঙ্গে আর বিশেষ কোনো সম্পর্ক রহিল না। যীশুর বিষয়ে উল্লেখ আছে, "He was in the world, but not of the world"—তিনি জগতে ছিলেন, কিন্তু জগৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই বাণী এ স্থলেও প্রয়োজ্য।

এইরূপে, পরমহংস মশাই তখনকার দিনে শিমলার অনেক বাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি শিমলার সকলেরই এক প্রকার পরিচিত লোক ছিলেন, নিতান্ত ঘরের লোক ছিলেন। গুরুগিরির ভাব বা আড়ম্বর তাঁহার কিছুই ছিল না। অতি সাধারণ লোকের ন্যায়, তিনি ইচ্ছামতো, এবাড়ি-ওবাড়ি যাইতেন; একলাই অনেক সময় যাইতেন; আর, সকলেই তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বিশেষ সম্মান করিতেন।

সুরেশ মিত্তিরের 'কারণ' করা

রামদাদা বৈষ্ণব মানুষ। মাংস তো তিনি কখনও খান নাই; মাছ কখনো খাইতেন, কখনো বা খাইতেন না। এক দিন রামদাদা পরমহংস মশাইকে বলিয়াছিলেন, "সুরেশ মিত্তির মদ খায়। তাকে বারণ করুন, যেন সে আর মদ না খায়।"—সুরেশ মিত্তির সওদাগরী অফিসের মুৎসদ্দী ছিলেন। তাঁহাকে সারা দিন খাটিতে হইত; এইজন্য, সন্ধ্যার সময় 'কারণ'[১] করিয়া অনেক সময় জপ করিতেন। কিন্তু, এক এক সময়

১ তন্ত্রসাধনার উপকরণ, মদ্য

কারণের মাত্রা একটু বেশি হইয়া যাইত; তখন তিনি পরমহংস মশাই-এর বিষয় অধিক মাত্রায় কথা কহিতেন, তবে, অন্য কোনো বিষয়ে চাঞ্চল্য হইত না। পরমহংস মশাই রামদাদার ঐ কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলেন, "সুরেশ মদ খায়, তাতে তোর কি? ওর ধাত আলাদা, ও নিজের পথে যাবে।" সুরেশ মিত্তির আসিলে পরমহংস মশাই বলিলেন, "ইচ্ছে হয় তো মদ খেয়ো, কিন্তু যেন পা টলে না, মন টলে না।" আমরাও তদবধি দেখিতাম যে, সুরেশ মিত্তির সন্ধ্যার সময় কারণ করিয়া উপরের ছাদের পাঁচিলের পাশে বসিয়া নিম্নস্বরে শ্যামা-বিষয়ক গান শুরু করিতেন; তাহার পর, কণ্ঠস্বর উচ্চ হইত; ক্রমে, করুণ স্বরে রোদন আরম্ভ করিতেন। পরে, ক্রন্দনের মাত্রা এত অধিক হইত যে, আশ-পাশের সব বাড়ি হইতে উহা শুনা যাইত। মিত্তিরদের বাড়ি আমাদের বাড়ির ভিতরের দিক্‌টার সংলগ্ন ছিল। এইজন্য, আমরা তাঁহার ক্রন্দনের স্বর শুনিতে পাইতাম, এবং তিনি উপরের ছাদে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম।

কাঁকুড়গাছির বাগানে

আমার এইরূপ শুনা আছে যে, রামদাদা এক দিন পরমহংস মশাইকে তাঁহার কাঁকুড়গাছির বাগানে লইয়া গিয়াছিলেন। তবে, আমি নিজে এ বিষয় কিছু জানি না।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, রামদাদা ঐ জমি খরিদ করেন। বাবার[১] পরামর্শমতো ও অনুমোদনক্রমে জমি সম্বন্ধে লেখাপড়া হইয়াছিল। রামদাদা, পরে, উহাতে বাগান[২] করিয়াছিলেন।

১ শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্ত, কলিকাতা হাই-কোর্টের অ্যাটর্নি ছিলেন

২ বর্তমানে এই বাগান 'যোগোদ্যান' নামে খ্যাত

পরমহংস মশাই ও নরেন্দ্রনাথ

পরমহংস মশাইকে কেহ কেহ ভক্তি করিতেন, তাঁহার জন্য উৎসবাদি করিতেন ও দক্ষিণেশ্বরে দ্রব্যাদি পাঠাইতেন; কিন্তু, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুবকগণের উপর তাঁহার এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল; এইজন্য, তিনি তাঁহাদিগকে এত খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এবং পরিশেষে, যুবা রাখালকে কাছেও রাখিয়াছিলেন।

গুরুভক্তি ও গুরুর আদেশ পালন—এই দুইটির ভিতর বিশেষ পার্থক্য আছে। সাধারণ ভক্তেরা গুরুর দেহটিকেই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া গণ্য করেন, এবং গুরুর প্রতি যতটুকু ভক্তি করা প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, ঠিক ততটুকু ভক্তি করিয়াই নিজেদের কার্যে ব্যস্ত থাকেন; তাঁহাদের গুরুভক্তি বা কার্য সেইখানেই শেষ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর ভক্তেরা নীচেই পড়িয়া থাকেন, উচ্চ অবস্থায় আর উঠিতে পারেন না; এমন কি, কালে, মুমূর্ষু জড়-পিণ্ডবৎ হইয়া যান।

অপর এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন, যাঁহারা জীবনের প্রত্যেক কার্যে গুরুর চিন্তাধারা বা আদেশ প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন; অর্থাৎ, গুরুর জন্য সমস্ত জীবনই তাঁহারা উৎসর্গ করেন।

অধিকাংশ লোকই কেবল গুরুভক্তি দেখাইয়া কর্তব্য শেষ করিতেন; কিন্তু, নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ ক-একজন মাত্র যুবক গুরুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, গুরুভক্তি অপেক্ষা গুরুর আদেশ পালন করাই শ্রেষ্ঠ। এ বিষয় অনেক কিছু চিন্তা করিবার ও বলিবার আছে। ইহা নিজে নিজে বুঝিয়া লওয়া উচিত।

যাহা হউক, পরমহংস মশাই, প্রথম হইতেই, নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ যুবকগণের যে কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য, যাঁহারা তাঁহাকে মাত্র ভক্তি করিতেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভবিষ্যতে তাঁহার আদেশ পালন করিবেন, তাঁহার ভাবসমূহ জগৎকে দিবেন ও কার্যে পরিণত করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রথম হইতেই তিনি বিশেষ আপনার করিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহাদের উপরই তাঁহার বিশেষ টান ছিল। অপর সকলকে তিনি ভক্ত হিসাবে ভালবাসিতেন মাত্র।

এ বিষয়ে এক দিনকার একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। শুনিয়াছি যে, নরেন্দ্রনাথ পরমহংস মশাই-এর নিকট যাইবার কিছু কাল পরে, কোনো এক যুবক আর এক জনের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। যুবকটির সঙ্গে যে লোকটি ছিলেন, তাঁহার কাছে নরেন্দ্রনাথের কুশল সংবাদ পাইয়া পরমহংস মশাই বলিলেন, "নরেন অনেক দিন আসে নি, দেখতে ইচ্ছে হয়েছে, এক বার আসতে বলো।" পরমহংস মশাই-এর সহিত কথাবার্তা কহিয়া, রাত্রে, তাঁহারা তাঁহার ঘরের পূর্ব দিকের বারাণ্ডায় উভয়ে শয়ন করিলে কিছু কাল পরেই, পরমহংস মশাই বালকের মতো তাঁহার পরনের কাপড়খানি বগলে করিয়া তাঁহাদের এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ঘুমোচ্ছ?" যাঁহাকে ডাকিয়া পরমহংস মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, না।" পরমহংস মশাই বলিলেন, "দেখ, নরেনের জন্যে প্রাণের ভেতর যেন গামছা-নেংড়ানোর মতো মোচড় দিচ্ছে!" সে রাত্রিতে নাকি পরমহংস মশাই-এর নরেন্দ্রনাথের জন্য উৎকণ্ঠ ভাব কিছু-মাত্র কমে নাই। কারণ, তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করিবার পর, আবার আসিয়া ঐ কথাই বলিতে লাগিলেন;

যেন, নরেন্দ্রনাথের অদর্শনের জন্য বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়ায় তাঁহার ঘুম হইতেছিল না।

পরমহংস মশাই, আমাদের গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বাড়িতে, নরেন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে খুঁজিতে আসিতেন; কিন্তু কখনো বাড়ির ভিতর প্রবেশ করেন নাই, রাস্তায় অপেক্ষা করিতেন। তিনি বাড়ির একটু কাছে আসিলে, অনেক সময় আমি অগ্রসর হইয়া যাইতাম। আমায় বলিতেন, "লরেন কোথায়? লরেনকে ডেকে দাও।" আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া দাদাকে সন্ধান করিয়া ডাকিয়া দিতাম। অনেক সময় পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন।

পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথকে আদর করিয়া 'শুকদেব' বলিয়া ডাকিতেন; শুকদেব যেন দ্বিতীয় বার জগতে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ শুকদেবের মতো জ্ঞানী হইবে, জগতের সমস্ত কার্য করিবে, কিন্তু জগৎকে ছুঁইবে না, প্রভৃতি বহুবিধ অর্থে তিনি নরেন্দ্রনাথকে শুকদেব বলিতেন। বাবা এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিতেন, "হ্যাঁ, হয়েছে বটে, ব্যাসদেবের বেটা শুকদেব। ম্যাক্‌নামারার বেটা কফিন-চোর!" —অর্থাৎ, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব মহৎ হইয়াছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু, বড়সাহেব ম্যাক্‌নামারার পুত্র হইল কিনা শবাধার-চোর! নরেন্দ্রনাথ সেই রকম হইবে! তখনকার দিনে 'কফিন-চোর' কথাটির বড় প্রচলন ছিল। নরেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ লোক হইবে, এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়া এইরূপ বলিতেন। তিনি বিরক্ত হইতেন না, বরং খুশি হইতেন।

নরেন্দ্রনাথ ছুটি পাইলে, নিজে নৌকা বাহিয়া দক্ষিণেশ্বরে

যাইত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ের সময় নরেন্দ্রনাথ গঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইত, এইজন্য, বাবা অনেক সময় বিরক্ত হইতেন। তিনি বলিতেন, "যাতায়াতের একখানা গাড়ি করে গেলেই তো হয়। এ রকম ঝড়-তুফানে গঙ্গা দিয়ে যাবার কি দরকার? রাম তো টানা গাড়ি করে যায়। —একেই বলে, ডানপিটে ছেলের মরণ গাছের আগায়। এ রকম ডানপিটেমি করার কি দরকার?" কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এ সকল কথায় বিশেষ কান না দিয়া, নিজের মনোমত দুই-একটি বন্ধু সঙ্গে লইয়া নৌকা করিয়া অনেক সময় দক্ষিণেশ্বরে যাইত। হেদোর পুকুরে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে নৌকার দাঁড় টানিতে বেশ পারদর্শী হইয়াছিল। আহিরীটোলার ঘাটে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, অনেক সময় নিজেরাই মাঝীদের দাঁড় লইয়া টানিতে টানিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইত। এইরূপ যাওয়াতে কতকটা নৌকা বাহিয়া আমোদ করা হইত, এবং পরমহংস মশাইকে দর্শন করিতে যাওয়াও হইত।

তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি করিয়া যাইবার পথ অতি কষ্টকর ছিল। গরাণহাটা হইতে বরানগরের বাজার পর্যন্ত গাড়ি যাইত, তাহার পর, সমস্ত পথটা হাঁটিয়া যাইতে হইত। আলমবাজার ও দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানসমূহ একেবারেই পাড়াগাঁ ছিল। মাঝে মাঝে গোলপাতার ঘর, ফাঁকা মাঠ, জঙ্গল ও পুকুর; এখনকার মতন এত বসতি ছিল না। দক্ষিণেশ্বর সামান্য একটি ছোট গ্রামের মতো ছিল। আমরা গিরিশবাবুর ঘর হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির সর্বদাই দেখিতে পাইতাম। কারণ, তখন মাঝখানে উঁচু ঘর-বাড়ি ইত্যাদি বিশেষ কিছু ছিল না। গিরিশবাবু ও অপর সকলে সন্ধ্যার সময় উত্তর দিকে মুখ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের

মন্দিরকে প্রণাম করিতেন। এখন অনেক বাড়ি হওয়ায়, গিরিশবাবুর বাড়ি হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির আর দেখা যায় না। ইহা হইল ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

নরেন্দ্রনাথ কোনো কথা মানিয়া লইবার পাত্র ছিল না। তর্ক-যুক্তি ও বিশেষ বিচার না করিয়া, সে কখনো অপরের কোনো কথা গ্রাহ্য করিয়া লইত না। পান্তাভেতে মুমূর্ষু ভাব তাহার ভিতর আদৌ ছিল না। পরমহংস মশাই-এর কাছে যে সকল মুমূর্ষু ভক্ত যাইতেন, তাঁহারা বলিতেন, "এ ছোঁড়া কি দাম্ভিক! বড়মানুষের বেটা, কলেজে পড়ে, তাই এত অহঙ্কার।" হরমোহন মিত্রের নিকট শুনিয়াছি যে, কথাপ্রসঙ্গে পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথকে এক দিন বলিয়াছিলেন, "তুই যদি কথা না শুনিস, তবে এখানে কি করতে আসিস?" নরেন্দ্রনাথ অমনি চট্ করিয়া জবাব দিল, "তোমার কাছে আবার শিখবো কি? তুমি কী-বা পেয়েছ, তোমার কাছে শেখবার বিশেষ এমন কী আছে?" পরমহংস মশাই তাহাতে বলিলেন, "তোর শেখবার যদি কিছু না থাকে, তবে এমন ঝড়-ঝাপটে আসিস কেন?" নরেন্দ্রনাথ অমনি উত্তর করিল, "তোমায় ভালবাসি বলে দেখতে আসি।" পরমহংস মশাই সমাধিস্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সকলেই কিছু স্বার্থের জন্য আসে, যে-যার অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে আসে। নরেন কিন্তু ভালবাসে বলে আসে, ওর কোনো অভীষ্ট এখানে নেই। এ হল নিঃস্বার্থ ভালবাসা। আর সকলে যারা আসে, তারা কোনো আকাঙ্ক্ষা করে আসে।" উপস্থিত ব্যক্তিসকল প্রথমে নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, দাম্ভিক ছোঁড়াটা পরমহংস মশাই-এর মুখের উপর চট্‌পট উত্তর করে। কিন্তু

পরমহংস মশাই যখন নরেন্দ্রনাথকে প্রশংসা করিলেন, তখন সকলে নীরব হইয়া রহিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সব সময় পরমহংস মশাইকে বলিত, "তুমি মুক্‌খু লোক, লেখাপড়া জান না, তোমার কাছে আবার দর্শনশাস্ত্রের কথা কি শিখবো? আমি এ সব বিষয় ঢের জানি।" কখনো কখনো তর্কের ছলে তাহার কথার মাত্রা আরো বাড়িয়া যাইত। অপরে ইহাতে বিরক্ত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। পরমহংস মশাই হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "ও আমাকে গাল দেয়, কিন্তু ভেতরে যে শক্তি আছে, তাকে গাল দেয় না।" পরমহংস মশাই-এর কী গুণগ্রাহী ভাব, কী উদার ভাব! সংকীর্ণ ভাব, গুরুগিরির ভাব—এ সব কিছুই তাঁহার ছিল না। এইজন্য, তিনি ঝাঁজালো ও তেজী নরেন্দ্রনাথের এত প্রশংসা করিতেন এবং তাহাকে এত ভালবাসিতেন। ইহাকেই বলে কদর দান, গুণের আদর করা।

নরেন্দ্রনাথ এইরূপ ঝাঁজালো মেজাজে পরমহংস মশাই-এর সহিত সমান সমান ভাবে তর্ক করিত। পরমহংস মশাইও তাহাতে হাসিয়া আনন্দ করিতেন। এক ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথের অনুকরণ করিয়া পরমহংস মশাই-এর সহিত কথা কহিতে গিয়াছিলেন। পরমহংস মশাই অমনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "লরেন বলে—লরেন বলতে পারে, তা বলে তুই বলতে যাস নি। তুই আর লরেন এক না।" এই বলিয়া তাঁহাকে ধমক দিয়াছিলেন।

দেখা গিয়াছে যে, অতি শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ কাহারো কথা অল্পতেই মাথা পাতিয়া লইত না, বা নিজ অপেক্ষা অপর কাহাকে সহজে বড় বলিয়া মনে করিত না। এইরূপ ভাবই তাহার স্বাভাবিক শক্তির পরিচায়ক। সর্বদাই

তাহার ভিতর এই একটি ভাব ছিল—যত বড় লোকই আসুক না কেন, সে নিজের ভিতর হইতে শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া, সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তির তুল্য শক্তি দেখাইতে পারে; এমন কি, প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি অপেক্ষা আরো অধিক শক্তি বিকাশ করিতে পারে। নরেন্দ্রনাথ নিজ হইতে উচ্চতর ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান করিত, নিম্নতর ব্যক্তিকে স্নেহ করিত, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করিতে পারিত না; প্রতিদ্বন্দ্বীকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বিধ্বস্ত বা পরাভূত করিতে পারিত, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হইত না। ইহা হইল তাহার শক্তিমত্তার বিশেষ লক্ষণ। নীচু বা অবনত হওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণ হইতে সে যে উচ্চ—এ বোধ থাকিলেও, কাহাকেও অবজ্ঞা বা অসম্মান দেখানোও তাহার রীতি ছিল না। অপরকে সম্মান করিব, শ্রদ্ধা করিব, কিন্তু নিজের প্রাধান্য ও শক্তি বা ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিব, এই ছিল তাহার ভাব। যাঁহারা দুর্বলমস্তিষ্ক ছিলেন, তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের এই ভাব বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় বলিতেন, "নরেন অতি দাম্ভিক, অহংকারী; হামবড়াইগিরি তার বড্ড বেশি।"

জগতের কাছে আমি ভিক্ষা লইতে আসি নাই, আমি জগৎকে ভিক্ষা দিব, আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, এই ছিল নরেন্দ্রনাথের আশৈশব ভাব। শুনিয়াছি, পরমহংস মশাই এক দিন আহ্লাদ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে একটি জিনিস দিতে গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ অমনি বলিয়া উঠিল, "তোমার কাছে জিনিস নেবো কেন আমি? আমার কিসের অভাব? তুমি এ জিনিস অপরকে দাও গে যাও, আমি নেবো না।" এই সামান্য কথাগুলিতেই নরেন্দ্রনাথের মনোভাব বুঝা যায়।

বুদ্ধের জীবনী পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যখন তিনি

কুমার সিদ্ধার্থরূপে নিজ গৃহে ছিলেন, বা যখন তিনি তাপস গৌতমরূপে বিচরণ করিতেন, এবং নিজের এক মুষ্টি অন্নও জুটিত না, উভয় অবস্থাতেই, তাঁহার উচ্চ ভাব বা ওজস্বী ভাব ছিল। এইজন্য, লোকে তাঁহাকে 'সুন্দর শ্রমণ,' 'মহাশ্রমণ' বলিত।

সুপুরুষ-সন্ন্যাসী, মহাসন্ন্যাসী বা মহাত্যাগী হওয়া এক কথা, আর ভিখারী হওয়া আর এক কথা। কোনো কিছু দিয়া ইহার পরিমাপ করা যায় না, কারণ ইহা হইল মনের বৃত্তি। একজন সর্বত্যাগী, গাছের তলায় পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও, তাহার রাজকীয় ভাব দীপ্ত থাকে; আর এক জনের বহু বিত্ত থাকিলেও, তাহার ভিখারীর ভাব দূর হয় না। নরেন্দ্রনাথ পরমহংস মশাই-এর কাছে যাইত ভিখারীর ভাবে নয়; য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রাদিতে যাহা পাঠ করিয়াছিল, তাহা কতদূর সত্য, মিলাইয়া লইবার জন্য পরমহংস মশাই-এর কাছে যাইত, এবং তর্ক-যুক্তি ও বাদানুবাদ করিয়া সেই সকল মতের সিদ্ধান্ত করিয়া লইত।

এক দিন নরেন্দ্রনাথ একটি যুবককে বলিয়াছিল, "ওঁর কাছে যাই, সমাজ বা অন্য বিষয় শেখবার জন্যে নয়। এ সব বিষয় ওঁর কাছে শেখবার কিছুই নেই। এ সব বিষয় আমি ঢের পড়েছি, ঢের জানি; তবে দেখ, ওঁর কাছে Spirituality—ব্রহ্মজ্ঞান শিখতে হবে। এটা ওঁর কাছে আশ্চর্যরকম আছে।"

বোধিসত্ত্বের আরাড়কালাম, রামপুত্র রুদ্রক প্রভৃতি পণ্ডিত-গণের সহিত বিচারের বিষয় পাঠ করিলে, পরমহংস মশাই-এর সহিত নরেন্দ্রনাথের বিতর্ক অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়।

অপ্রিয় হইলেও, নরেন্দ্রনাথ তর্ককালে দুই-একটি কড়া কথা বলিয়া ফেলিত। উপস্থিত-উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল

তাহার অতি আশ্চর্যরূপ—দৈবশক্তির মতো। এইজন্য, কেহ তাহার সহিত তর্ক করিতে সাহস করিত না।

এক দিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত নরেন্দ্রনাথের তর্ক হইতেছিল। ডাক্তার সরকার তর্কের সময় অনেক পুস্তকের নাম করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ চট্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মশাই, আপনি কি বইটা পড়েছেন, না দেখেছেন?" ইহাতে ডাক্তার সরকার হঠাৎ কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন নরেন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করিল, "না, জিগ্‌গেস করছি, বইটা মাত্র উলটে দেখেছেন, না পড়েছেন?" অবশেষে, ডাক্তার সরকার অপ্রতিভ হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি পুস্তকের খানিক অংশ মাত্র পড়িয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ অমনি পুস্তকের অনেক স্থান উদ্ধার করিয়া ডাক্তার সরকারকে শুনাইতে লাগিল, এবং বলিল, "আমি ঐ বইখানা অনেক দিন আগে পড়েছি।" ডাক্তার সরকার আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এত অল্প বয়সের ছেলে যে এত পড়েছে, তা আমি কখনো জানতুম না।"

কাশীপুরের বাগানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। গিরিশবাবুও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। গিরিশবাবু খুব পণ্ডিত লোক। তিনিও অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, নরেন্দ্রনাথ এই অল্প বয়সে কি করিয়া এত বই পড়িয়াছে!—এখানে জানা আবশ্যক যে, নরেন্দ্রনাথ ইংরেজী সাহিত্যে ও য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কি ইতিহাস, কি সাহিত্য, কি কাব্য, কি জ্যোতিষ, কি দর্শনশাস্ত্র, প্রভৃতি বহু বিষয়ে সে সুপণ্ডিত ছিল।

পরমহংস মশাই কখনো কখনো আনন্দ করিয়া এই রকম তর্ক-বিতর্কের সময়ে কথাবার্তা কহিতে যাইতেন। নরেন্দ্রনাথ ছিল রুদ্রমূর্তি, তাহার কাছে খাতির আবদার বড় চলিত

না। সে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিমাণ বুঝিত। তখন অনেক সময় নরেন্দ্রনাথ মুখঝামটা দিয়া পরমহংস মশাইকে বলিত, "তুমি দর্শনশাস্ত্রের কি জান? তুমি তো একটা মুক্‌খু লোক।" পরমহংস মশাই আনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "লরেন আমাকে যত মুক্‌খু বলে, আমি তত মুক্‌খু লই!" তিনি নিজের বাঁ-হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিতেন, "আমি অক্ষর জানি।" অর্থাৎ, অক্ষর চেনা পর্যন্ত তাঁহার বিদ্যালাভ হইয়াছিল।

এ স্থলে ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, পরমহংস মশাই-এর সহিত নরেন্দ্রনাথের মতো কেহ কথা কহিতে সাহস করিত না। মাত্র নরেন্দ্রনাথই নির্ভীক হইয়া পরমহংস মশাইকে এরূপ কথা বলিত। সাধারণ ভক্তেরা নরেন্দ্রনাথের এইরূপ কথাবার্তা অনেক সময় পছন্দ করিত না ও উহার ভাব বুঝিতে পারিত না। এক প্রদীপ হইতে অপর এক প্রদীপ জ্বালিয়া লইবার সময় একটি চিড়চিড় শব্দ হয়, এবং পরে, উভয় প্রদীপের শিখা একই প্রকার হইয়া যায়, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। যাহারা কৃপা-ভিখারী, তাহারা নরেন্দ্র-নাথের এইরূপ আচরণে ও কথাবার্তায় অনেক সময় বিরক্তই হইত; কারণ, এই সকল ব্যাপার হইল তাহাদিগের ধারণার অতীত। Self-assertion—আত্ম-প্রতিষ্ঠা যে অন্যবিধ ভাব, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিত না। তাহারা মনে করিত, নির্জীব ও মুমূর্ষু হইয়া কথা শুনিয়া যাওয়াই শ্রেয়। কৃপা-ভিখারী হওয়া—এই ভাবটি নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ঘৃণা করিত। নিজেকে বেচিয়া ফেলা বা গোলামি করাকে, সে অবজ্ঞা করিত। নিজের ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিয়া অপরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করাই ছিল নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। এইজন্য, অপর ভক্ত-

গণের সহিত তাহার মিল হইত না। নরেন্দ্রনাথ রুদ্রভাব দিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইত। ইহাই হইল ক্ষাত্রশক্তি। পূর্বকালে, ক্ষত্রিয়েরা গুরুকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া গুরুর সম্মান প্রচার করিতেন। মহাভারতে ও টড-এর রাজস্থান গ্রন্থে উদয়পুরের উপাখ্যানে এইরূপ ক্ষাত্রশক্তির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের রুদ্র অংশে জন্ম; রুদ্র তাহার মূর্তি। রুদ্র অংশে জন্মগ্রহণ না করিলে, রুদ্রের ভাব কেহ বিকাশ করিতে পারে না। ইহা অপরের অনুকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

নরেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যতে সর্ববিজয়ী হইবে, পরমহংস মশাই পূর্বেই তাহার আভাস পাইয়াছিলেন। এইরূপ মুখ-ঝামটার ভিতরও, নরেন্দ্রনাথের যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আনন্দ করিতেন। এই সময়কার কথাবার্তা যদি কেহ চেষ্টা করিয়া লিপিবদ্ধ করেন তো, তাহা হইলে, একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে পারে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, আমার বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়। পূর্বের দিন, চাকর, সরকার প্রভৃতি অনেক লোকজন ছিল; কিন্তু, পর দিন, আমরা একেবারে গরিব হইয়া পড়ি, কিছুই সংস্থান ছিল না। সংসারের সকল ভার নরেন্দ্রনাথের উপর পড়িল। সে তখন আইন পড়িতেছিল এবং এক অ্যাটর্নির আর্টিক্‌লড ক্লার্ক হইয়াছিল। কিন্তু, সেখান হইতে কিছু পাইবার আশা ছিল না। সংসার কি করিয়া চলিবে, এই চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। এইরূপ ভাবনায় তাহার মাথার ভিতর সর্বদা যন্ত্রণা হইত বলিয়া, মাথা ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে, সে কর্পূরের নাস লইত। বাল্যকাল হইতেই তাহার নাস লওয়ার বদ অভ্যাস ছিল।

এই সময়, গরমিকালে, এক দিন পরমহংস মশাই

রামদাদার বাড়িতে আসেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া লইয়া যাইবার জন্য অনেক লোককে পাঠাইলেন; কিন্তু, নরেন্দ্রনাথের অভিমান হওয়ায়, কিছুতেই তাঁহার কাছে যাইল না। বাহিরের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সে একাকী বসিয়া রহিল, দরজা খুলিল না। তিন-চার জন লোক আসিয়া ফিরিয়া গেল। অবশেষে, সন্ধ্যার সময়, দেবেন মজুমদার মশাই নরেন্দ্রনাথকে ডাকিতে আসিলেন। দেবেনবাবুর কী অমায়িক ভাব, নরেন্দ্রনাথের প্রতি কী তাঁহার ভালবাসা! তিনি মিষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া নরেন্দ্রনাথকে অনুনয় করিলে, নরেন্দ্রনাথ যাইতে বাধ্য হইল। সে কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া, চটি-জুতা পরিয়া, রামদাদার বাড়িতে গেল। বৈঠক-খানার দক্ষিণ দিকের দরজার কাছে, পরমহংস মশাই-এর গালিচাখানির সম্মুখে গিয়া সে বসিল। তখনো তাহার অভিমান ছিল, কিন্তু, শিষ্টাচারের খাতিরে পরমহংস মশাইকে ঢিপ করিয়া একটি গড় করিল—প্রণাম করিতে হয়, সেইজন্য প্রণাম করিল মাত্র। পরমহংস মশাই অতি সস্নেহে নরেন্দ্র-নাথের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আস নি কেন এতক্ষণ? তুমি না এলে যে আসর জমে না। আমরা হলুম নর, তুমি যে নরের ইন্দ্র।" এইরূপ অনেক মিষ্ট কথায় তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। লোকজন অনেক হওয়ায় ঘরটি বড় গরম হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মিনিট ক-এক ঘরে থাকিয়া বলিল, "ঘরটা বড় গরম, আমি বাইরে গিয়ে বসি।" এই বলিয়া সে রাস্তার বেঞ্চিতে হাওয়ায় গিয়া বসিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহার মাথার যন্ত্রণা কমিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথের প্রতি পরমহংস মশাই-এর কী ঐকান্তিক ভালবাসা! এত লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি

করিতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন, কিন্তু, তাহা হইলেও পরমহংস মশাই-এর মন তত প্রসন্ন ছিল না। কারণ, নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকাতে তিনি একেবারে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যেন কোনো কিছু তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না।

আমাদের এই সময়কার অবস্থার একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

মা একখানি চেলীর কাপড় পরিয়া আহ্নিক করিতেন। কাপড়খানি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলেন যে, একখানি চেলীর বা গরদের কাপড় হইলে তাঁহার আহ্নিক করার সুবিধা হয়। নরেন্দ্রনাথের তখন কোনো কাজ-কর্ম ছিল না, কোথা হইতে সে কাপড় দিবে? কাপড় দিবার ক্ষমতা নাই জানিয়া, নরেন্দ্রনাথ মাথা হেঁট করিয়া মা'র সম্মুখ হইতে বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কোনো কথার উত্তর দিল না।

একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এই সময়ে পরমহংস মশাইকে একখানি গরদের কাপড় ও একটি বিকানিরের মিছরির থালা দিয়া প্রণাম করিয়া যান। থালাখানির মাঝখানে ডুমো ডুমো মিছরি দিয়া ভরতি করা। এখন সে রকম মিছরির থালা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। খুব উৎকৃষ্ট জিনিস বলিয়াই মারোয়াড়ী ভদ্রলোকটি উহা পরমহংস মশাইকে দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ইহার দুই-এক দিন পরে দক্ষিণেশ্বরে যায়। পরমহংস মশাই জিদ করিতে লাগিলেন, "গরদের কাপড়, মিছরির থালা তুই নিয়ে যা।" নরেন্দ্রনাথ তাঁহার কথায় কিছুতেই সম্মত হইল না। অবশেষে, পরমহংস মশাই বলিলেন, "তুই গরদখানা নে, তোর মা পরে আহ্নিক করবেন।" এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল—ঠিক

কথাই তো, বাড়িতে ঠিক এই কথাই তো হইয়াছিল! তখন সে আপত্তি না করিয়া নীরব হইয়া রহিল। কিন্তু জিনিসটি নিজে হাতে লইল না, চলিয়া আসিল।

দুই-এক দিনের মধ্যেই পরমহংস মশাই রামলালদাদাকে[১] বলিলেন, "রামলাল, তুমি শীগ্‌গির করে খেয়ে নাও। এই গরদখানা আর মিছরির থালাখানা শিমলেয় গিয়ে নরেনের মা'র হাতে দিয়ে আসবে, অপরের হাতে দিও না।"

রামলালদাদা তাঁহার নির্দেশমতো শিমলায় আসিলেন। তখন গরমিকাল, বড় রৌদ্র, বেলা এগারোটা হইয়া গিয়াছিল। তিনি আসিয়া আমাকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। আমি অগত্যা মাকে ডাকিয়া আনিলাম। রামলালদাদা মা'র কাছে সমস্ত কথা বলিয়া তাঁহার হাতে সেই গরদের কাপড়খানি ও মিছরির থালাখানি দিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "এখানে কথা হয়েছে, আর দক্ষিণেশ্বরে তখনই টেলিগ্রাফ হল!"

অবশেষে, আমাদের সংসারে অতিশয় কষ্ট আসিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাতে একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িল। কি উপায়ে সে যে সংসার চালাইতে পারিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া একেবারে বিষণ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় সে কাহারো সহিত মিশিত না। তাহার পূর্বকার প্রফুল্ল ভাব একেবারে চলিয়া গেল; সে ম্লান হইয়া পড়িল। এক দিন সে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মশাইকে বলিল, "আপনি মাকে বলুন, যাতে আমার মা-ভাইদের খাওয়া-পরার কষ্ট দূর হয়। এত কষ্ট আর সহ্য করা যায় না।" পরমহংস মশাই বলিলেন,

১ শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র

"তুই মা কালীকে প্রণাম করে যা চাইবি, তাই পাবি।" নরেন্দ্রনাথ কালীর মন্দিরে যাইয়া সংসারের অভাবমোচনের জন্য মা কালীর কাছে প্রার্থনা করিবে, এইরূপ মনস্থ করিয়া পরমহংস মশাই-এর ঘর হইতে বাহির হইল। উঠান দিয়া যাইবার সময় সে এক প্রকার গাঢ় নেশায় অভিভূত হইয়া পড়িল। মন্দিরে যাইয়া মা কালীকে প্রণাম করিয়া সংকল্পিত ইচ্ছাসকল ভুলিয়া গিয়া বলিতে লাগিল, "মা, আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও।" তাহার পর, পরমহংস মশাই-এর ঘরে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, মা'র কাছে প্রার্থনা করেছিস?" নরেন্দ্রনাথ বলিল, "মশাই, ভুলে গেছি।" পরমহংস মশাই বলিলেন, "যা, ফের যা।" নরেন্দ্রনাথ পুনরায় গিয়া সকল কথা ভুলিয়া গিয়া বলিল, "মা, আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও।" নরেন্দ্রনাথ মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিলে পরমহংস মশাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, বলেছিস তো?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিল, "না মশাই, ভুলে গেছি।" পরমহংস মশাই পুনরায় তাহাকে মন্দিরে মা কালীর কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথও তাঁহার নির্দেশমতো মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিল; কিন্তু, সেই একই প্রার্থনা—"মা, আমায় বিবেক-বৈরাগ্য দাও।" মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সে ভাবিল, নিশ্চয়ই পরমহংস মশাই-এর জন্য এইরূপ ভুল হইতেছে। পরমহংস মশাই-এর কাছে ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, "আমি মা কালীকে প্রণাম করতে গিয়ে সব ভুলে গেলুম, এখন আপনাকে মাকে জানাতে হবে।" এইরূপ করিবার জন্য পরমহংস মশাইকে সে ধরিয়া বসিল। পরমহংস মশাই তখন বলিলেন, "তা আমি কি করবো? তুই বলতে পারলি নি, তোর মনে এল না?—ও-রে, তোর অদেষ্টে সংসার-সুখ নেই, তা আমি কি করবো!

যা হোক, তোদের সংসারে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।”

নরেন্দ্রনাথ ইহার পর হইতে সংসারের জন্য আর চিন্তা করিত না, বা করিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না। সংসারের কষ্ট আরো ভীষণ হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ পরমহংস মশাইকে সংসারের কোনো কিছু কথা আর না বলিলেও, পরমহংস মশাই কিন্তু মনে মনে এ বিষয় চিন্তা করিতেন, এবং অপরের কাছে নরেন্দ্রনাথের সংসারের অনটনের কথা বলিয়া দুঃখ করিতেন। নরেন্দ্রনাথের সংসারের অতিশয় কষ্ট জানিয়া মাস্টার মশাই[১] এই সময় এক শত টাকা দিয়াছিলেন। তাহাতে মাস-তিনেক কোনো রকমে চলিয়াছিল। এইজন্য, পরলোকগত মাস্টার মশাই-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এ কথা অপর কেহই জানেন না। এখন এ সকল কথা অপ্রকাশিত রাখিবার প্রয়োজন নাই।

ভবিষ্য জীবনে নরেন্দ্রনাথ যে কি করিবে, তাহা এ সময়ে সে স্থির করিতে পারিতেছিল না। বাহ্যিক ও আনুষঙ্গিক ঘটনাসমূহ এক প্রকার, আবার নিজের ভিতরটা আর এক প্রকার জিনিস চাহিতেছে। এইরূপ সংযোগক্ষেত্রে সে যে কোন্ পথে যাইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। পরমহংস মশাই কিন্তু তাহার ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধে একটু আভাস দিয়াছিলেন। কালীর মন্দিরে প্রার্থনারূপ ব্যাপারটি নরেন্দ্রনাথের জীবনের স্রোত এক বিশেষ দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মা কালীকে প্রণাম করিয়া যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, তাহাই তাহার ভবিষ্য জীবনে ফলিয়াছিল। আর, পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথের বিষয় যাহা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,

১ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তাহাও সত্য হইয়াছিল। কিন্তু, নরেন্দ্রনাথ তখন বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার ভবিষ্য জীবন কিরূপ হইবে, বা তাহাকে কি কাজ করিতে হইবে।

সামান্য নরেন্দ্রনাথ কি করিয়া বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দ হইল—এ বিষয়টি বিশেষ করিয়া চিন্তা করা আবশ্যক। বিবেকানন্দের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বা প্রত্যেক সোপান, বিবেকানন্দের মনোবৃত্তির পরিবর্তন, প্রভৃতি সকল বিষয় বিশেষ করিয়া অনুধ্যান করা আবশ্যক। বিবেকানন্দ আকাশ হইতেও পড়ে নাই বা এক দিনেও তৈয়ার হয় নাই। জীবনে, উচ্চে উঠিতে হইলে, ধাপে ধাপে উঠিতে হয়। নানা প্রকার ঝঞ্ঝা ও বিপদ, নানা প্রকার বাধা-অন্তরায় অতিক্রম করিয়া উচ্চে উঠিতে হয়। এই ঝঞ্ঝা ও বিপদ বা অন্ধকারে কাহারো কিছু ভয় করিবার নাই। জীবনের স্রোত এই রকমই হইয়া থাকে; হতাশ হইবার কারণ নাই। জীবনের পথ অতীব কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম ও অন্ধকারময়। প্রত্যেককেই এই পথ দিয়া চলিতে হয়। কিন্তু, একাগ্রতা ও আত্মনির্ভরতা থাকিলে, সাধারণ লোকও অনেক উচ্চে উঠিতে পারে।

পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথকে যে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা আরো দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে।

এক দিন একজন লোক পরমহংস মশাইকে বলিয়াছিলেন, "আপনি নরেনকে এত ভালবাসেন কেন? নিজের ছোট হুঁকোয় করে নরেনকে তামাক খেতে দিলেন, হুঁকোটা যে এঁটো হয়ে গেল। ও যে হোটেলে খায়, ওর এঁটো কি খেতে আছে?" এইরূপ মাতব্বরী করিয়া তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। পরমহংস মশাই তাঁহার কথা শুনিয়া বড় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে শালা, তোর কি রে? নরেন হোটেলে

খাক বা যাই খাক, তাতে তোর কি? তুই শালা যদি হবিষ্যিও খাস, আর নরেন যদি হোটেলে খায়, তা হলেও তুই নরেনের সমান হতে পারবি নি।" এইরূপ তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিলেন।

এক দিন এক মারোয়াড়ী ব্যক্তি পরমহংস মশাইকে খুব ভাল কালাকন্দ বরফি দিয়া যান। যুবা যোগেন বলিল, "দিন্ না মশাই, আমি খাব।" পরমহংস মশাই বলিলেন, "ওদের সংকল্প করা জিনিস, ও খাস নি, পেট ছেড়ে দেবে; ও শুধু নরেন খেতে পারে।" যুবা যোগেন বলিল, "আমরা সব খেতে পারি, আমাদের ওতে কিছু আসে যায় না। নরেন কায়েতের ছেলে, ও যদি খেয়ে সহ্য করতে পারে তো, আমরা সাবর্ণ-চৌধুরী[১] বামুন, জমিদার, সব সহ্য করতে পারি।"

যোগেনের বাড়ি কালীমন্দিরের নিকটেই ছিল। এক দিন যোগেনের পিতা, চৌধুরী মশাই, মন্দিরের বাগানে আসিয়া নেবু তুলিয়া লইতেছিলেন। পরমহংস মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগেন আসে না কেন?" চৌধুরী মশাই বলিলেন, "তার পেট ছেড়ে দিয়েছে, তাই নেবু নিয়ে যাচ্ছি।"

ক-এক দিন পর, যুবা যোগেন আসিলে, পরমহংস মশাই বলিলেন, "দেখলি, মারোয়াড়ীদের সংকল্প করা জিনিস খেলে পেট ছেড়ে দেয়!"

মারোয়াড়ীদের সংকল্প করা জিনিস পরমহংস মশাই নিজেও খাইতেন না, এবং একমাত্র নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আত্ম-গোষ্ঠীর অপর কাহাকেও দিতেন না। তিনি বলিতেন, "নরেন খেতে পারে; ওর ভেতর আগুন জ্বলছে, কাঁচা কলাগাছ দিলেও পুড়ে ছাই হয়ে যায়।"

১ সাবর্ণি গোত্র

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

হৃদু মুখুজ্যের কাছে শুনিয়াছিলাম যে, পরমহংস মশাই বলিয়াছিলেন, "দেখ্, যখন আমি খাবারের আগভাগ অপরকে দিয়ে খাব, তখন জানবি যে আমার দেহ আর বেশি দিন থাকবে না।" এই কথা শ্রীশ্রীমাঠাকরুন[১] ও হৃদু মুখুজ্যে জানিতেন। পরমহংস মশাই নিজের আহার করিবার জিনিস নিবেদন করিয়া প্রথমে নিজে আগভাগ লইতেন, পরে, অপরকে দিতেন। হৃদু মুখুজ্যে বলিয়াছিলেন, "এক দিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে গেছে। বিকেলে মামাকে জলখাওয়ার জন্যে গুটিকতক সন্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামা আগে নরেনকে সন্দেশ খেতে দিলেন। আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমি বুঝতে পারলুম, তিনি আর দেহ রাখবেন না। এই কথা মাঠাকরুনকে জানালুম; তিনিও বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। পরে দেখলুম, তাঁর কথা ঠিক হয়েছে। অল্প দিন পরেই তিনি অসুস্থ হলেন; তাঁর দেহ গেল।" হৃদু মুখুজ্যে বড় ব্যথিত হইয়া এই বিষয়টি আমাকে ক-এক বার বলিয়াছিলেন। এ স্থলে জানা আবশ্যক যে, পরমহংস মশাই অপর কাহাকেও খাবারের আগভাগ দেন নাই।

হৃদু মুখুজ্যের কথাবার্তা শুনিয়া ও ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, পরমহংস মশাই যেন নরেন্দ্রনাথের ভিতর আপনার প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ বা সত্তা দর্শন করিয়াছিলেন। সেইজন্য, অপর দেহকে বা দেহের অভ্যন্তরস্থিত সত্তাকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। —ইহা যে ভুল, এ কথা বলা যায় না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইল, নিজের দেহ বা আধার চলিয়া যাইলে, নিজ সত্তাকে অপর আধারে বা শরীরে

১ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, শ্রীসারদামণি দেবী

বিদ্যমান রাখা। ইহা হইল Continuance of one's own existence—নিজ সত্তার ধারাবাহিকতা। গুরুপরম্পরায় এই শক্তি আধার হইতে আধারে চলিয়া আসিতেছে, আসিবেও। ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, কৃপা করা যাহাকে বলে, ইহা সেরূপ নয়। ইহা হইল Self-reflection—আত্মপ্রতিবিম্ব বা আত্মপ্রতীক সম্মুখে দেখা। একই শক্তি বা একই সত্তা, দুই আধারে সমানভাবে রহিয়াছে। একটি শক্তি অপর শক্তির প্রতিবিম্ব মাত্র, ভিন্ন আধারে অবস্থান করিতেছে মাত্র। এইজন্য, পরমহংস মশাই নিজ আহারের আগভাগ নরেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে ইহাকে বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা প্রক্রিয়া মাত্র বলিয়া বুঝিবে। কিন্তু, চিন্তা করিলে ইহার ভিতর যে নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। "প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ" অর্থাৎ, একটি প্রদীপ হইতে অপর একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া লইলে, উভয়ের মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য থাকে না, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

পরমহংস মশাই যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, গরমিকালে, পরমহংস মশাই-এর শরীর অসুস্থ হয়। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় আনা হইল। প্রথমে বলরামবাবুর বাড়িতে ও শ্যামপুকুরের একটি বাড়িতে তাঁহাকে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। শেষকালে, তাঁহাকে কাশীপুরের বাগানে আনা হয়। প্রকৃতপক্ষে, কাশীপুরের বাগানেই পরমহংস মশাই-এর আত্মগোষ্ঠী বিশেষরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গোষ্ঠী, ত্যাগী ভক্ত ও সাধারণ ভক্ত, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পরে, ইঁহারা সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত নামে অভিহিত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, এই কাশীপুরের বাগানেই পরমহংস মশাই দেহরক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

উত্তর ভাগ

প্রদর্শিকা

'অব্যক্ত' বা 'অখণ্ড' শক্তি মানুষের বোধের অতীত। অখণ্ড শক্তির বিষয় আমরা চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু, তাহার সহিত একীভূত হইয়া যাইতে পারি। অব্যক্ত বা অখণ্ড শক্তিকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি, কারণ, মানুষের চিত্তে এইরূপ তিন অবস্থা হয়। অবশ্য, ইহা আমাদের কল্পনা মাত্র। অখণ্ড শক্তির নিম্ন স্তর হইল, শক্তির সাম্য-অবস্থা—Equilibrium state of Energy. সাম্য-অবস্থার নিম্ন স্তর হইল, চঞ্চল অবস্থা—Active state of Energy. চঞ্চল অবস্থা হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য সাম্য-অবস্থা বলা হয়; যেন, চঞ্চল অবস্থা ধীরে ধীরে উপশান্ত হইয়া অখণ্ড-ভাব আসিবার উপক্রম হইতেছে। অখণ্ড ও খণ্ড—এই দুই ভাগের মধ্যবর্তী অবস্থাকে সাম্য-অবস্থা বলা হয়। সাম্য-অবস্থা পর্যন্ত এক প্রকার চিন্তাশক্তি থাকে; তাহার পর চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হয়। 'চিন্তা' হইল বিভিন্ন কম্পন বা প্রকম্পনের পরিমাণ, দ্বিধা বিভক্ত বা নানা খণ্ডে বিভক্ত, এবং দেশ-কাল-নিমিত্তের অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য, চিন্তা সেখানে চলিতে পারে না।

শক্তির চঞ্চল বা সক্রিয় অবস্থা হইতেই শক্তির বিষয় আমাদের কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। এই সক্রিয় শক্তি বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, যেন, এক-একটি যতি বা রেখা বা সূত্র প্রধাবিত হইতেছে। শক্তি যখন সক্রিয় বা চঞ্চল-ভাবে থাকে, তখন ইহার প্রধাবমান অবস্থা হইতে স্পন্দন উদ্ভূত হয়। এই স্পন্দন হইতে 'গুণ' উদ্ভূত হয়; এবং, গুণ দুই-এর অধিক বিন্দুতে বা ক্ষেত্রে সমাহিত হইলেই

'রূপ' বা 'অবয়ব' বা 'পরমাণু' সৃষ্ট হয়, ইহাকে রূপ বা অবয়বের অবস্থা বা পরমাণুর অবস্থা বলা হয়। একরৈখিক বা একমাত্রিক পরমাণু আমাদের চিন্তার অতীত। দুই রেখা-যুক্ত বা দুই মাত্রাবিশিষ্ট পরমাণুও আমাদের চিন্তার অতীত। তিন রেখা বা তিন মাত্রাযুক্ত পরমাণুই আমাদের চিন্তার গোচর, কিন্তু ইহা আমরা দেখিতে পাই না। এইজন্য, এই পরমাণুকে 'চিৎ-জড়-গ্রন্থি' বলা হয়। ইহা একভাবে হইল 'চিৎ', অপরভাবে হইল 'জড়'। অবয়ব আছে, এইজন্য 'জড়' বলা হইল; কিন্তু অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল চিন্তাশক্তির অধীন, এইজন্য ইহাকে বলা হইল 'চিৎ'।

এইরূপে সক্রিয় শক্তি বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া স্পন্দিত হওয়ায় পরমাণু উৎপন্ন হয়। পরমাণু হইল a bit of Energy, enveloped with Energy and is propelled by Energy, অর্থাৎ, পরমাণু—শক্তির এক কণা, শক্তির দ্বারা আবরিত এবং শক্তির দ্বারা প্রধাবিত। অর্থাৎ, 'জড়' ও 'চেতন' একই বস্তু, কেবল প্রক্রিয়া ও বিকাশের তারতম্যে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। য়ুরোপীয় দার্শনিক মতে 'জড়' এক বস্তু এবং 'চেতন' বা 'শক্তি' অপর এক বস্তু। কিন্তু এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, 'চেতন' বা 'শক্তি' ও 'জড়' একেরই নামান্তর, কোনো প্রভেদ নাই। একটি হইল পরি-দৃশ্যমান, অপরটি হইল অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য; এই মাত্র প্রভেদ।

প্রকম্পনই হইল সৃষ্টির আদি কারণ।

প্রত্যেক পরমাণুর অবিরত কম্পন বা প্রকম্পন হইতেছে। 'দেহ' হইল প্রকম্পমান পরমাণুর স্রোত; উহা বহির্দেশ হইতে বহু ছিদ্র দিয়া এক কেন্দ্রে আগমন করিতেছে, এবং বহু ছিদ্র দিয়া অপসারিত হইতেছে। প্রত্যেক পরমাণু নূতনভাবে আসিতেছে, এবং পুরাতন সকল পরমাণুই পরিবর্তিত হইতেছে।

অনবরত এই পরিবর্তনের মধ্যে যাহাই স্থিতি, তাহাকেই 'দেহ' বলিয়া থাকি।

পরমাণুপুঞ্জ একত্রিত হইয়া এক রেখায় অবস্থান করিলে তাহাকে 'স্নায়ু' বলা হয়। খড়ের আঁটি যেমন একত্রীভূত করিয়া রাখা হয়, স্নায়ুপুঞ্জ ঠিক সেইরূপ অবস্থান করে। স্নায়ুপুঞ্জকে স্তরে স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যেমন, স্থূল-স্নায়ু, সূক্ষ্ম-স্নায়ু, কারণ-স্নায়ু, মহাকারণ-স্নায়ু, প্রভৃতি অনেক প্রকার। স্থূল-স্নায়ু, অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ু হইতে ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উদ্ভূত হয়।

প্রত্যেক স্নায়ু এক এক প্রকার উদ্দেশ্য বা এক এক প্রকার ক্রিয়ার জন্য গুণবিশিষ্ট হইয়াছে। দুই গুণ বা দুই ক্রিয়া এক স্নায়ুতে হইতে পারে না।

স্নায়ু হইল অন্তঃশূন্য। অন্তঃশূন্য হইলেও কিন্তু, শূন্য স্থানেও অতিসূক্ষ্ম পরমাণুসমূহের প্রকম্পন বা ধ্বংসন হওয়ার জন্য উহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশ পায়। এক বা বহু স্নায়ু হইতে এইরূপ শক্তিরেখা বহির্গত বা সঞ্চালিত হওয়ায়, একটি স্রোত বা প্রবাহ সৃষ্ট হয়। এই স্রোত বা প্রবাহ হইল 'মন'।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রমতে 'মন' ছয়টি স্তরে বিভক্ত। ইহা-দিগকে 'লোক' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি, যথা, কামলোক, রূপলোক, ভাবলোক, জ্ঞানলোক ও আনন্দ-লোক। সর্বোচ্চ স্তর হইল 'অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি' বা 'পূর্ণ পরজ্ঞান'-এর অবস্থা।

আমরা মনকে যে প্রকার স্নায়ু—স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ, প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রধাবিত করিতে সমর্থ হই, অব্যক্ত বা অখণ্ড শক্তিকেও ঠিক সেইরূপ আখ্যা দিয়া থাকি বা বর্ণনা করিয়া থাকি। সেইজন্য, যাহা অখণ্ড,

তাহাও পরিশেষে খণ্ড বা জড়বৎ বলিয়া পরিদৃশ্যমান হয়; আর, এইজন্য, বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির মধ্যে এত তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

স্নায়ুর স্পন্দনের অতীত যে কি আছে বা কি অবস্থা, তাহা আমাদের বোধগম্য বা ধারণা হইতে পারে না; কারণ, আমাদের সমস্ত জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গোচর বা অতীন্দ্রিয় যাহাই হউক না কেন, কোনো-না-কোনো স্নায়ু-প্রকম্পন দ্বারা উপলব্ধ হয়। যিনি যে পরিমাণে মনকে সূক্ষ্ম-স্নায়ুর ভিতর দিয়া প্রধাবিত করিতে পারিবেন বা সূক্ষ্ম-স্নায়ু জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে বিশাল ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যিনি যে পরিমাণে মনকে স্থূল-স্নায়ু দিয়া প্রধাবিত করিবেন বা স্থূল-স্নায়ুতে অবস্থান করিবেন, অর্থাৎ, মনকে স্থূল-স্নায়ুতে রাখিবেন, তিনি সেই পরিমাণেই বিচ্ছিন্ন ও নিকৃষ্ট ভাবে জগৎকে দেখিতে থাকিবেন। এই সকল কারণে মনকে 'উচ্চ' বা 'নীচ' শব্দে বিভক্ত করা হয়।

মোট কথা, চেষ্টা বা শক্তি নিয়োগ, চলিত কথায় যাহাকে 'সাধনা' বলা হয়, তাহার দ্বারা যিনি যত স্নায়ু জীবিত বা সজীব করিতে পারিবেন বা রুদ্ধ স্নায়ুমুখসমূহ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন, এবং উহাদিগের অভ্যন্তরস্থিত নালীর ভিতর দিয়া অতিসূক্ষ্ম পরমাণুসমূহের সহায়ে শক্তি প্রধাবিত করিতে পারিবেন, তাঁহার মনোবৃত্তি বা মনের পরিধি সেই প্রকার হইবে।

এই ক-একটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত স্মরণ রাখিয়া পরমহংস মশাই-এর ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করিলে, আমরা তাঁহাকে এক আশ্চর্য ব্যক্তিরূপে দেখিতে পাই।

———০———

ব্যক্ত ও অব্যক্তের সন্ধিস্থলে

সাধারণতঃ, লোকে স্থূল-স্নায়ুপুঞ্জে অবস্থান করে এবং দৈনন্দিন কার্য করিয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধারণ লোক ও একজন বিশিষ্ট লোকের মধ্যে কোনো-ই পার্থক্য থাকে না। সাধারণ লোক স্থূল-স্নায়ুস্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে পারে না। কিন্তু, মহাপুরুষেরা ইচ্ছা করিলে স্থূল-স্নায়ু বা স্থূল-শরীর হইতে সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা সূক্ষ্ম-শরীরে যাইতে পারেন; এমন কি, তাঁহারা সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা সূক্ষ্ম-শরীর হইতে, কারণ-স্নায়ু বা কারণ-শরীরে যাইতে পারেন; কারণ-শরীর হইতে মহাকারণ, এবং মহাকারণ হইতে মহাব্যোমেও যাইতে পারেন। সাধারণ লোক স্থূল অবস্থা হইতে আর ঊর্ধ্বগামী হইতে পারে না। ইহাই হইল সাধারণ লোক ও মহাপুরুষদিগের মধ্যে পার্থক্যের কারণ।

পরমহংস মশাই যখন স্থূল-শরীরে থাকিতেন তখন তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মতো দেখা যাইত। লক্ষ্য করিতাম, তাঁহার কথাবার্তা কিছু জড়ানো, তোতলার মতো। অল্প-বয়স্ক বালকেরা সেই সকল কথাবার্তা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিত। দেখিতাম যে, তিনি পাড়াগেঁয়ে ভাষায় নানা প্রকার হাসি-কৌতুক করিতেছেন, যাহা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের রুচি-বিগর্হিত। এইজন্য, অনেক শিক্ষিত লোক তাঁহাকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিত। কিন্তু, এই পাড়াগেঁয়ে লোকই সহসা তাঁহার মনোবৃত্তি পরিবর্তন করিয়া অপর এক রূপ ধারণ করিতে পারিতেন; এবং, তখন তিনি যে কত উচ্চে উঠিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। সাধারণ অবস্থা হইতে অতি দ্রুতবেগে তাঁহার বিবর্তন হইত। একজন অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে লোক সহসা কিরূপ হইয়া যাইতে

লাগিল। হাতের আঙুলের ও পেশীর স্নায়ুসকল স্থির ও নিশ্চল হইল; চোখের পাতা নিস্পন্দ; দৃষ্টি—একাগ্র, স্থির; মুখের স্নায়ুসকল—দৃঢ়, গম্ভীর ও আজ্ঞাপ্রদ, এবং আরো অনেক প্রকার উচ্চ ভাব যেন একসঙ্গে বিকাশ পাইতে লাগিল! একেবারে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পূর্ব ব্যক্তি হইতে অসীম পার্থক্য! এই সময় তাঁহার মুখ দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইতাম, কিন্তু অনেক সময় মুখের আভা সহ্য করিতে পারা যাইত না।

দেখিতাম যে, এইরূপ স্থির ও সমাধিস্থ হইয়া যাইবার পূর্বে বা পরে, কি একটি একমাত্রাযুক্ত বা একযতিযুক্ত অস্ফুট শব্দ তিনি উচ্চারণ করিতেন, তাহা কিছু বুঝা যাইত না। এই এক অক্ষরের শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি স্থির হইয়া যাইতেন; আবার কখনো বা নিশ্চল অবস্থা হইতে সচল অবস্থায় আসিবার সময় এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতেন। এক অক্ষরের এই শব্দ অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে, ধীরে ধীরে, দেহের ভিতর মন আনিতেন। এই সময় দেখিতাম, হাত-পা যেমন পূর্বে স্থির হইয়া গিয়াছিল, এখন সে ভাবটি কাটিয়া গিয়া আঙুলগুলি নরম হইল, এবং ডান হাতের কাছের জলের গেলাসটি হইতে একটু জল খাইলেন—ধীরে ধীরে মন যেন দেহে নামিয়া আসিতে লাগিল। তাহার পর, অনেক পরিমাণে সাধারণভাবে কথা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু তখনো অনেকটা ঘোর ঘোর ভাব থাকিত। ক্রমে ক্রমে, ক-এক মিনিট পরে, বেশ সাধারণ লোকের মতো হইলেন।

পরমহংস মশাই-এর এই ভাবটি বা অবস্থাটি আমি অনেক বার দেখিয়াছি। এইজন্য, বিষয়টি বিশেষ করিয়া এই স্থলে উল্লেখ করিলাম। অপর যাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন এবং

এখনো জীবিত আছেন, তাঁহারাও এ বিষয় বেশ স্মরণ করিতে পারিবেন। তাঁহার সেই সময়কার মুখের ভাব দেখিয়া বেশ বুঝা যাইত যে, তিনি যেন কি একটি আশ্চর্য, অদ্ভুত ও নূতন জিনিস দেখিয়া সকলকে বলিতেছেন: "শীগ্‌গির শীগ্‌গির আয়, এই জিনিস দেখবি আয়!" এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে করিতেই তাঁহার স্থূল-স্নায়ুর বা প্রাথমিক সূক্ষ্ম-স্নায়ুর ক্রিয়াসমূহ বন্ধ হইয়া যাইত, চিন্তাস্রোত বা বিকাশভাব একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যাইত; কেবল, মহাকারণ বা অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুর প্রক্রিয়া এবং চিত্ত-আকাশ ও চিৎ-আকাশের বিভিন্ন স্তরের প্রক্রিয়া চলিত। এইজন্য, কণ্ঠ দিয়া এই একমাত্রাযুক্ত অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইত। এই ধ্বনি প্রচলিত কোনো শব্দের মতো নয়। আর, ভাষা দিয়া যত না হউক, কণ্ঠের স্বর, মুখের কান্তি ও আভা দিয়া, তিনি সেটি কিছু বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। এইটি অতি বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। স্বামিজী তাঁহার একটি গীতে এই অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন:

"অস্ফুট মন-আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর।"

ইহা হইল অতি উচ্চ অবস্থার কথা। ইহা হইল 'বাণী'। ব্যক্ত ও অব্যক্তের সন্ধিস্থলে যাওয়া-আসা করিবার সময় এইরূপ বাণী নির্গত হইয়া থাকে। পরমহংস মশাই যখন নির্বিকল্প সমাধিতে যাইতেন, বা নির্বিকল্প সমাধি হইতে নামিতেন, ঠিক সেই সময় এইরূপ একটি বাণী তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনেও এইরূপ ভাবের কথা উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও পরমহংস মশাই-এর জীবনে এই ভাবটি দেখিতে পাই। অপর কোনো মহাপুরুষের জীবনে ঠিক এইরূপ ভাবের বিষয় উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহাপুরুষদিগের যে সকল উক্তি সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ হইয়া ধর্মগ্রন্থরূপে জগতে প্রচলিত হয়, তাহা বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক চিন্তা হইতে অপর এক চিন্তার মধ্যে একটি ফাঁক রহিয়া গিয়াছে; দার্শনিক প্রথা অনুযায়ী ধারাবাহিকরূপে তাহা লিখিত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, মহাপুরুষেরা যে সকল উচ্চ চিন্তা করিয়াছিলেন, সেখানে ভাষা চলে না। অপর দিকে, উচ্চ অবস্থায় আরোহণকালে, বা উচ্চ অবস্থা হইতে অবরোহণ-কালে, শক্তির সন্ধিস্থলে, তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে যে একযতিযুক্ত গভীর ভাবব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ নির্গত হইয়াছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রোতারা তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিবার শক্তিও সকলের ছিল না। এইজন্য, অপ্রয়োজনীয় বোধে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাহার পর হইল, মহাপুরুষগণ কর্তৃক উক্ত—দার্শনিক মত। দার্শনিক মত হইল অতীব জটিল এবং উপলব্ধির বিষয়। মাত্র এক বা দুই ব্যক্তির জন্য তাহা কথিত হয়। সাধারণ লোকের নিকট দৈনন্দিন্ কার্যের বিধি-নিষেধই হইল ধর্মের চরম অবস্থা বা পরাকাষ্ঠা—*Summum bonum* of religion. মহাপুরুষদিগের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, বিধি-নিষেধ হইল ধর্ম-জীবনে অতি তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, মহাপুরুষদিগের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত অস্ফুট শব্দ বা বাণী এবং তাঁহাদিগের উক্ত দার্শনিক মত বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর বিষয়—বিধি-নিষেধ, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া জগতে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া প্রচলিত হয়। এইরূপ গ্রন্থে, কোন্‌টি মেধ্য এবং কোন্‌টি অমেধ্য, মাত্র ইহাই বিচার করা হয়। অবশ্য, এই

সকল ব্যাপার অনিবার্য, ও চিরকালই থাকিবে। দার্শনিকগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু এই বিধি-নিষেধের মোহে পড়েন না!

দ্রুত চিন্তাস্রোতে

চোখ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: নরনেত্র, ঋষিনেত্র ও দেবনেত্র। নরনেত্র হইল—সাধারণতঃ যে সকল চোখ দেখা যায়। এইরূপ চোখের দৃষ্টিতে সাধারণ ভাব থাকে। ঋষিনেত্রের দৃষ্টিতে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে যাওয়ার ভাব প্রকাশ পায়। দেবনেত্রের দৃষ্টিতে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আসার ভাবটি প্রকাশ পায়। শিবের নেত্র হইল ঋষিনেত্র। দুর্গার নেত্র হইল দেবনেত্র। চলিত কথায়, দেবনেত্রকে শঙ্খ, পদ্ম ও মীন নেত্র বলা হয়। শঙ্খনেত্র হইল, শঙ্খকে লম্বাদিকে দুই ভাগ করিলে যেরূপ দেখিতে হয়, সেইরূপ। পদ্মনেত্র হইল, পদ্মফুলের পাপড়ির মতো দেখিতে। মীননেত্র হইল, দুইটি মাছ যেন মুখোমুখি হইবার চেষ্টা করিতেছে। বাংলাদেশের বিগ্রহে, বিশেষতঃ স্ত্রীবিগ্রহে, পদ্মনেত্র প্রযুক্ত হয়; কখনো বা শঙ্খনেত্র প্রযুক্ত হয়। রাজযোগের ভাষায়, শঙ্খনেত্রের দৃষ্টি হইল নাসিকার অগ্রভাগে; পদ্মনেত্রের দৃষ্টি হইল নাসিকার মূলে; মীননেত্রের দৃষ্টি হইল ভ্রূর মধ্যে। এ সকলই হইল দেবনেত্রের লক্ষণ, অর্থাৎ, যেন অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতেছে।

নরেন্দ্রনাথের নানারূপ ভাবের সময় যাঁহারা তাঁহার চোখের দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেবনেত্র সম্বন্ধে ভাল বুঝিতে পারিবেন। নরেন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টি, সাধারণ অবস্থায়, ঋষিনেত্রের দৃষ্টির মতো ছিল। শিবনেত্র যে কত প্রকার হয়, ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে চলিয়া যাইবার কালে চোখের দৃষ্টি যে কত প্রকার হয়, নরেন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টি দেখিয়া তাহার আভাস পাওয়া যাইত। দেহ ও দেহজ্ঞান ত্যাগ

করিয়া সমাধিস্থ অবস্থায় যাইলে চোখের দৃষ্টি কিরূপ হয়, নরেন্দ্রনাথের চোখে তাহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইত।—মহাশক্তিপূর্ণ, আজ্ঞাপ্রদ, স্তব্ধকারী ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দূরত্ব ও প্রতিবন্ধসমূহ ভেদ করিয়া যেন অগ্রগামী হইতেছে! এইজন্য, বক্তৃতাকালে তাঁহার চোখের দৃষ্টিতেই অনেকে জড়সড় হইয়া যাইত। তিনি যেন অধিনেতা বা অধিনায়করূপে জগৎকে আদেশ করিতেছেন; প্রখর দৃষ্টি, দুর্দমনীয় তেজ—বাধা-বিঘ্ন কিছুই গ্রাহ্য করিতেছে না; সমস্ত জগৎকে তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া যেন নূতনভাবে গঠন করিবেন—ঠিক এই ভাবটি তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইত।

পরমহংস মশাই-এর দৃষ্টি ছিল শান্ত স্নিগ্ধ, কিন্তু অতি উচ্চ মার্গের। কত উচ্চ মার্গের বা উচ্চ অবস্থার, কোন্ স্তরের ও কিরূপ তাহার ভাব, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না; কিন্তু, দেখিতাম যে, তাঁহার কাছে যাইতে বা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে কাহারো সাহস হইত না। রামদাদার বাড়িতে বা শিমলাতে যখন তিনি আসিতেন তখন কাহাকেও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। তাঁহাকে ভাল লাগিত, দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু, একটু তফাৎ হইতে। তিনি যখন ঘরে বসিয়া থাকিতেন, তখন একঘর লোক থাকিত; কিন্তু কোনো প্রকার চপল ভাব প্রকাশ পাইত না, এমন কি, কোনো ব্যক্তি অঙ্গসঞ্চালন পর্যন্তও করিত না। কোন্ এক স্নিগ্ধ, অসীম ব্যোমে তিনি সকলের মনকে লইয়া যাইতেন, তাহার কিছুই বুঝা যাইত না। প্রশ্ন করা তো দূরের কথা, এমন কি, কেহ মাথা বা ঘাড় নাড়িতেও পারিত না। এইজন্য, পরমহংস মশাই-এর চোখের দৃষ্টি যে কত প্রকার হইত, তাহা সেই সময় ঠিক বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু সাধারণ লোকের দৃষ্টি হইতে

উহার যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাব—অন্তর্দৃষ্টি, এইটাই দেখিতাম। কেহ যেন ইহা সাধারণ লোকের দৃষ্টির সহিত তুলনা না করেন। দেহ ছাড়িয়া মন যখন অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে, তখন যেমন দৃষ্টি হয়, ঠিক সেইরূপ দৃষ্টি হইয়া চোখের তারা অন্য প্রকার হইয়া যাইত। যে অবস্থায় তাঁহার মন থাকিত, সেই অনুযায়ী তাঁহার চোখের দৃষ্টি ও তারা পরিবর্তিত হইয়া যাইত।

দেখিতাম যে, পরমহংস মশাই-এর চোখের পাতা দ্রুতভাবে নড়িত। অনেক সময় তাঁহার চোখ মিটমিট করিত। নরেন্দ্র-নাথ যখন কোনো গভীর চিন্তা করিতেন বা একটি নূতন ভাব দর্শন করিতেন, এবং সেই নূতন ভাবটিকে আয়ত্ত করিয়া অপরের কাছে বিকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেন, ঠিক সেই সময় তাঁহারও চোখ মিটমিট করিত। তবে, পরমহংস মশাই-এর চোখ যেরূপ সুস্পষ্টভাবে মিটমিট করিত, সেরূপ নহে।

পরমহংস মশাই-এর চোখ মিটমিট করার কারণ বুঝিতে হইলে বলিতে হইবে, তাঁহার চিন্তাস্রোত ও চিন্তাধারা এত দ্রুতবেগে চলিত যে, দেহের সমস্ত স্নায়ু নানাভাবে স্পন্দিত হইত; এই স্রোত বা ধারা প্রকাশ বা বিকাশের নিমিত্ত চোখের পাতা অনবরত পড়িত। স্নায়ুদৌর্বল্য হইলে চোখ মিটমিট করে, এবং এক রকম ব্যামোও আছে তাহাতে চোখ মিটমিট করে; ইহা সেরূপ নয়। দেখিতাম যে, প্রথমে তিনি অতি সাধারণ লোকের মতো বসিয়া আছেন ও কথা কহিতেছেন; কিন্তু, অল্পক্ষণ পরেই যখন কথাটি জমিয়া যাইল এবং উচ্চ দিকে কথা চলিল, তখন সহসা তাঁহার কণ্ঠের স্বর, মুখের ভঙ্গী ও চোখের দৃষ্টির পরিবর্তন হইতে লাগিল। ইহা যে কিরূপ অবস্থায় বা কত উচ্চ দিকে যাইত, তাহা কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে দেখিতাম যে, পূর্বে

যিনি সাধারণ ব্যক্তির মতো ছিলেন, সহসা তিনি পরিবর্তিত হইয়া অপর এক ব্যক্তি হইলেন। এইরূপ দ্রুত চিন্তাস্রোতে সমস্ত সূক্ষ্ম-স্নায়ু প্রকম্পমান হওয়ায় চোখের পাতা অনবরত নড়িত, এবং, পরে, স্থির হইয়া যাইত। তখন আর চোখের পাতা পড়িত না; চোখের চাহনি অন্য প্রকার হইয়া যাইত —স্থির ও নিশ্চল। ইহা বর্ণনা করা কাহারো সাধ্য নয়। আমি এ স্থলে কিছু আভাস দিতে প্রয়াস পাইলাম মাত্র। রাজযোগের চরম অবস্থায় পৌঁছিলে এইরূপ হইয়া থাকে।

সবিকল্প সমাধিতে

রামদাদার বাড়ির উঠানে পরমহংস মশাই-এর কীর্তনকালে, রামদাদা ও মনোমোহনদাদা অঙ্গসঞ্চালন করিয়া ও ভজন-গান করিয়া ভাবকে প্রবুদ্ধ করিবার ও মনকে উর্ধ্বে তুলিবার চেষ্টা করিতেন। শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁহারা মনকে ভাবরাজ্যে বা ভাবলোকে তুলিবার প্রয়াস পাইতেন। ইহাই সাধারণ কীর্তনের প্রথা। কিন্তু পরমহংস মশাই-এর কীর্তনের মধ্যে অন্য এক প্রকার ভাব দেখিতাম। ভাবের আধিক্য হওয়ায় তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন হইত; ভাবরাশি তাঁহার স্নায়ুপুঞ্জকে পরিপূর্ণ করিত। দেহ ভাবরাশির শক্তি ধারণ করিতে পারিত না বলিয়া, কখনো বা অঙ্গসঞ্চালন হইত, কখনো বা দেহ নিস্পন্দ হইয়া যাইত। সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকার আভা বাহির হইত। মুখের শ্রী যেন দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু তাহা এত গম্ভীর, উচ্চ ও অসাধারণ যে, তাহা অনেকক্ষণ দেখিতেও পারা যাইত না। সেই সময় কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না বা তাঁহার কাছেও অগ্রসর হইতে পারিত না। দেখিতাম যে, তিনি কীর্তনের সময় ভাবলোকের বিষয়, শব্দ না দিয়া, অঙ্গসঞ্চালন করিয়া প্রকাশ

করিতে প্রয়াস পাইতেন। ভাবসকল যেন পুঞ্জীভূত ও জীবন্ত হইয়া তাঁহার দেহ বা সূক্ষ্ম-স্নায়ুপুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিত, এবং সেইজন্য তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন হইত। অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা যে মনের উচ্চতর ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা এই প্রথম দেখিয়াছিলাম। গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরও ঠিক এইরূপ হইত।

সাধারণ লোকের কীর্তন হইল 'গতি' হইতে 'ভাব'-এ—From Motion to Ideas. পরমহংস মশাই-এর কীর্তন হইল ভাব হইতে গতিতে—From Ideas to Motion. এইজন্য, সাধারণ লোকের কীর্তন ও নৃত্যের সহিত তাঁহার কীর্তন ও নৃত্যের বিশেষ পার্থক্য আছে। সাধারণ লোকের নৃত্য হইল 'নরনৃত্য'। পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল 'দেবনৃত্য', যাহাকে চলিত কথায় বলে 'শিবনৃত্য'। ইহার সহিত চপল ভাবের কোনো সংস্রব নাই। ইহা হইল অতি উচ্চমার্গে অবস্থানের কথা বা উচ্চ অবস্থার কথা। এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোর হইয়া যাইত; যেন, সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া যাইতেন। অত লোক থাকিলেও, কেহই কথাবার্তা বা নড়াচড়া করিতে পারিত না; সকলেই যেন নির্বাক্, নিস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া থাকিত, সকলেই অভিভূত ও তন্ময় হইয়া পড়িত, সকলেরই মন তখন উচ্চ স্তরে চলিয়া যাইত। সাধারণ কীর্তনে চপল ভাব থাকে ও মনের গতি চঞ্চল হয়, কিন্তু এই কীর্তনে সকলেই যেন স্থির হইয়া যাইত। চাঞ্চল্যের ভিতর—স্থির ভাব, স্পন্দনের ভিতর—নিস্পন্দ ভাব!

এই সময় পরমহংস মশাই-এর দেহ হইতে যেন আর একটি ভাবদেহ বিকাশ পাইত। ইহা যে কত উচ্চ অবস্থার

বিষয়, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারিত না; কিন্তু ইহা যে অতি উচ্চ অবস্থার বিষয়—এইটা সকলেই অনুভব করিত। পরমহংস মশাই যেন ভাবমূর্তি ধারণ করিতেন, এবং স্বয়ং চাপ-জমাট ভাবমূর্তি হইয়া, সকলের ভিতর, অল্পবিস্তর, সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন। জীবন্ত ভাব কাহাকে বলে, আর কি করিয়া তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাহাই দেখিতাম। কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অনুভব করিতাম। এইজন্য, কীর্তনের সময়, কি গীত বা ভজন-গান হইত, গানের ভাষাই বা কি, তাহা কাহারো স্মরণ থাকিত না, বা আনুষঙ্গিক অন্য কোনো ব্যাপারের বিষয়ও মনে থাকিত না। সকলের দৃষ্টি পরমহংস মশাই-এর প্রতি নিবদ্ধ থাকিত। পরমহংস মশাই কিরূপে স্তরে স্তরে নরকায় হইতে দেবদেহে যাইতেন এবং কিরূপে এই দেহের প্রক্রিয়া হয় বা শক্তি-বিকিরণ হয়, তাহাই সকলে লক্ষ্য করিতাম। বেশ স্পষ্ট দেখিতাম যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা হইতে ক-এক মিনিটের ভিতর তিনি অপর এক ভাব ধারণ করিয়া অন্য এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। মানুষের দেহের ভিতর হইতে ভাবদেহ বা দেবদেহ উদ্বুদ্ধ হইত; সর্বত্রই যেন এক মহাশক্তি বা স্পন্দন বিকীর্ণ হইত।

একটি বিষয় আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতাম যে, কীর্তনকালে পরমহংস মশাই-এর পদসঞ্চালন প্রথম যে পরিধির ভিতর হইত, তাহার পর উহা এক ইঞ্চি আগেও যাইত না বা পিছনেও যাইত না, ঠিক যেন কাঁটায় কাঁটায় মাপ করিয়া তাঁহার পদসঞ্চালন হইত।

বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথের এইরূপ পদসঞ্চালন দেখিয়াছিলাম। কোনো কার্যবশতঃ নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিবার জন্য আমি একদিন বিকালবেলা প্রায় চারটার সময় বরানগর

মঠে যাই। গিয়া দেখিলাম যে, বাহিরের বারাণ্ডাতে নরেন্দ্রনাথ অনবরত পায়চারি করিতেছেন,—চক্ষু স্থির, দৃষ্টি উপরের দিকে, কোনো হুঁশ নাই, যেন দেহ হইতে মন অনেকক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে ; অভ্যাসবশতঃ পা আপনিই চলিতেছে, নিয়মিত স্থানের মধ্যে পদবিক্ষেপ হইতেছে, একটুও এদিক্-ওদিক্ হইতেছে না। এরূপ দেখিয়া আমার ভয় হইল। ভিতরকার দালানে গিয়া দেখিলাম সেখানে রাখাল মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ[১] , শরৎ মহারাজ[২] ও আর সকলে রহিয়াছেন। সকলেই মহা উদ্বিগ্ন, কি করিবেন যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নরেন্দ্রনাথ নাকি দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর হইতে এইরূপভাবেই পায়চারি করিতেছেন এবং ক-এক দিন ধরিয়া তিনি নাকি অনবরত জপ-ধ্যান করিতেছিলেন ও সবিকল্প-নির্বিকল্প সমাধি ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথাবার্তা ও আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। রাখাল মহারাজ আমাকে একান্ত কাতরভাবে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "ভাই, আমরা কেউ এগুতে সাহস পাচ্ছি না, তুমি সুমুখে গিয়ে খুব চেঁচামেচি করে নরেনের মনকে নামিয়ে আনো।" এই বলিয়া রাখাল মহারাজ আমাকে খুব অনুনয় করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখনো নরেন্দ্রনাথের কোনো হুঁশ নাই, অগত্যা আমি খুব চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে তাঁহার পদবিক্ষেপ-গতি স্থগিত হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে তাঁহার মন দেহে ফিরিয়া আসিল। অন্য কোনো সময় নরেন্দ্রনাথের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল কিনা আমার জানা নাই।

১ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

২ স্বামী সারদানন্দ

বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব সিদ্ধ হইয়া সাত দিন এবং সাত রাত্রি এক স্থানে পদসঞ্চালন করিয়াছিলেন, তাহার পর, তাঁহার দেহ শ্রান্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়। ইহাকে 'চঙ্ক্রমণ' বলে। চঙ্ক্রমণ অর্থে পায়চারি করা বুঝায়। চলিত বাংলায় ইহাকে 'চানকানো' বলে। বুদ্ধদেবের চঙ্ক্রমণের স্থানে বুদ্ধগয়ার মন্দিরে একটি লম্বা পিল্লা গাঁথা আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের এক একটি পদবিক্ষেপে এক একটি পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 'পদ্ম' অর্থে 'ধর্ম' বুঝায়। এইজন্য, পরবর্তী কালে ভক্তেরা ইহার নানারূপ অলৌকিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞান ও রাজ-যোগে ইহাকে এক প্রকার সবিকল্প সমাধি বলা হয়।

এইরূপ সবিকল্প সমাধির লক্ষণ হইল যে, পদবিক্ষেপের পরিমাপ প্রথম বারে যতখানি হয়, পরে তাহা অতিক্রম করিয়া এক ইঞ্চিও আগু-পাছু হয় না। এইরূপ অবস্থায় সর্বত্রই সাম্যস্পন্দন হইয়া থাকে। শরীরের স্নায়ুপুঞ্জের যেরূপ স্পন্দন হয়, পদবিক্ষেপেও সেইরূপ স্পন্দন হইয়া থাকে। আর একটি লক্ষণ হইল যে, চোখের দৃষ্টি অন্য প্রকার হইয়া যায়। চোখের তারা এমন অবস্থায় আসে যে, তাহাতে দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া যায়। এই অবস্থায় মন বা চিন্তাশক্তি, শরীরের বিভিন্ন স্থূল-স্নায়ুপুঞ্জ স্তরে স্তরে ত্যাগ করিয়া, অতি সূক্ষ্মস্নায়ু বা সূক্ষ্মতম স্নায়ুতে চলিয়া যায়। এইজন্য, স্থূল-স্নায়ু বা বিকাশমুখী স্নায়ুর কোনো প্রক্রিয়া থাকে না; কেবল, প্রথম অবস্থায় যেরূপভাবে পদসঞ্চালন বা দেহের ক্রিয়াদি হয়, তাহাই থাকিয়া যায়—যাহাকে Initial impetus বা প্রাথমিক আবেগ বা শক্তিপ্রয়োগ করা বলা হয়, সেইটুকুই থাকিয়া যায়।

পরমহংস মশাই-এর কীর্তনও ঠিক এইরূপ। ইহা সাধারণ

কীর্তনের মতো নহে—সকলে মিলিয়া উল্লম্ফন, আবর্তন, হস্তাদি সঞ্চালন, প্রভৃতি ব্যাপার নহে। এই কীর্তনকালে, উপস্থিত সকল লোকই দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত মাত্র। এই কীর্তন হইল—সবিকল্প সমাধি। এই সময় পরমহংস মশাই-এর ঘাড় ডান দিকে একটু বাঁকিয়া যাইত এবং তিনি হাত দুইটি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া সুমুখ ও পিছনে চলাচল করিয়া স্থির হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, একেবারে নিস্পন্দ ও নিশ্চল। সবিকল্প সমাধি হইতে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে যাইতেন। সাধারণ ভাষায় ইহাই হইল পরমহংস মশাই-এর কীর্তন। কিন্তু ইহা সাধারণ কীর্তন নহে, ইহা এক স্বতন্ত্র ব্যাপার।

পরমহংস মশাই-এর এই কীর্তনের ব্যাপার লইয়া অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা কেবল বলিবার বা পড়িবার বিষয় নয়, চিন্তা বা ধ্যান করিবার বিষয়। এই কীর্তন সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে হইলে, প্রত্যেককেই ইহা নিজে চিন্তা বা ধ্যান করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ, ইহা ভাষার ব্যাপার নয়।

সাম্যস্পন্দনে

উচ্চ অবস্থার বা জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ হইল যে, তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বরে সাম্যস্পন্দন—Rhythmical vibration থাকে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, সাধক অনবরত অভ্যাস, সাধনা বা তপস্যা দ্বারা অসামঞ্জস্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া সামঞ্জস্য বা সাম্য ভাবে উপনীত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। মানুষের সাধারণ অবস্থা হইল—দ্বন্দ্ব অবস্থা। ইহা হইল, 'বিপরীত গতিবাদ'-এর (Law of Opposite Current-এর) কথা। সাধনা বা তপস্যা হইল—নির্দ্বন্দ্ব

অবস্থায় যাওয়া। নিম্ন অবস্থায় প্রত্যেক পরমাণু, প্রত্যেক শক্তিরেখা বা গতি ও প্রত্যেক ভাব, পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে। কিন্তু, উচ্চ অবস্থায় এ সকলই সাম্যভাবে আসিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুসকল বা স্নায়ুপুঞ্জ দ্বন্দ্ব অবস্থায় প্রকম্পিত বা সঞ্চালিত হইতেছে। এই সকল কারণে, চিত্তে নানা প্রকার বিক্ষুব্ধ ভাব আসিয়া থাকে। যখন যে স্নায়ু প্রবল হইতেছে, তখন চিত্তের বৃত্তিও তাহার অনুযায়ী হইতেছে। এইজন্য, স্নায়ুপুঞ্জে বা দেহে নানা প্রকার শ্রান্তি, ক্লান্তি প্রভৃতি বিকৃত গতির শক্তি বিকাশ পায়। কিন্তু, চিত্ত বা চিৎ-শক্তি স্থূল-স্নায়ু হইতে যেরূপ সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়, ধীরে ধীরে সেইরূপ সাম্য-অবস্থা প্রকাশ পাইতে থাকে। পরিশেষে, সাধক যখন, অল্পক্ষণের জন্যই হউক বা অধিকক্ষণের জন্যই হউক, পূর্ণমাত্রায় সেই সাম্য-অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকেন, তখন তিনি এক স্বতন্ত্র পুরুষ হইয়া যান।

পরমাণুপুঞ্জ বা স্নায়ুপুঞ্জ অ-সাম্যভাবে স্পন্দিত হওয়ায় শরীরে এক প্রকার দাহকারী উত্তাপ অনুভূত হয়, ত্বক্ যেন অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে, যে পরিমাণে সাম্য-অবস্থা আসিতে থাকে, সেই পরিমাণে উত্তাপ ত্বক্ হইতে নিম্ন বা গভীর স্তরের স্নায়ুতে প্রবেশ করে, এবং ত্বক্-সংলগ্ন স্নায়ুপুঞ্জ শীতল হইয়া যায়; এমন কি, রক্তসঞ্চালন ধীরে ধীরে কমিয়া যাইয়া নাড়ীর গতি পঁয়তাল্লিশ-বেয়াল্লিশ মাত্রা হইয়া যায়। কখনো বা দেখা যায় যে, নাড়ীর বেগ এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে, গতি নাই বলিলেই হয়; অর্থাৎ নাড়ী নিষ্ক্রিয় হইয়া শরীরের উত্তাপ শীতল হইয়া যায়। ঠাণ্ডা বা গরম, এই দুইটি অবস্থা হইল একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিকাশ; কিন্তু, শীতল বা স্নিগ্ধ হইল অন্য এক প্রকার অবস্থা।

বাহিরের বায়ু অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া প্রবাহিত হইলেও স্নিগ্ধ স্নায়ুতে কোনো ক্রিয়া করিতে পারে না; অর্থাৎ, গরম বা কষ্ট কিছুই অনুভূত হয় না, বা ব্যথিত করিতে পারে না।

আর একটি বিষয় দেখা যায় যে, পরমাণুপুঞ্জ সাম্যভাবে স্পন্দিত হওয়ায়, গায়ের বর্ণ অন্যবিধ হইয়া উজ্জ্বল ভাব প্রকাশ পায়। গায়ের চর্ম বন্ধুর ও কর্কশ না হইয়া, মসৃণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এক প্রকার স্বচ্ছ আভা প্রকাশ করে। বর্ণ বা রং দিয়া বিচার করিলেও সাম্যস্পন্দনের তারতম্য বেশ বুঝা যায়। এইজন্য, সাধকের গায়ের বর্ণ সাধারণ লোকের গায়ের বর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া থাকে; শ্বাসপ্রশ্বাসও সাম্যভাবে হইয়া থাকে। চোখের দৃষ্টি কর্কশ বা রূঢ় না হইয়া, স্নিগ্ধ বা মধুর হইয়া যায়। সাম্যস্পন্দন হইতে উদ্ভূত শক্তি বা আভ্যন্তর চিন্তা চোখ দিয়া বিকাশ পাইয়া থাকে। হাত ও আঙুলের সঞ্চালন মধুর হয় ও আকর্ষণী শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। কণ্ঠস্বরেও এক মাধুর্যপূর্ণ স্নিগ্ধ ভাব ও আকর্ষণী শক্তি বিকাশ পায়। ইহাই হইল সাম্যস্পন্দনের বহির্বিকাশ। চিৎ-শক্তি যেরূপ সূক্ষ্ম স্নায়ু দিয়া পরিচালিত হইবে, সাম্যস্পন্দনপ্রসূত শক্তিরও সেইরূপ বিকাশ হইবে। যাহা 'খণ্ড', তাহা ত্যাগ করিয়া, যাহা 'অখণ্ড', তাহার চিন্তা করিলেই এই ভাব আসিয়া থাকে।

'পিথাগোরিঅ্যান'-দিগের মত হইল যে, সৃষ্টি সাম্যস্পন্দন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; পরে, সৃষ্টি অ-সাম্য বা দ্বন্দ্ব অবস্থায় উপনীত হওয়ায়, জগতের দুঃখ-কষ্ট বা নানারূপ বিকৃত ভাব উদ্ভূত হইয়াছে; এবং, পরিশেষে, সৃষ্টি সাম্যস্পন্দনে বা সাম্য-অবস্থায় উপস্থিত হইবে। তাঁহারা ইহাই সৃষ্টি ও দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। সাম্যস্পন্দনে পরিসমাপ্ত হওয়াকে শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা বলা হয়, যাহাকে চলিত

কথায় বলে—শান্তি পাওয়া। এই সাম্যস্পন্দন একটি স্বতন্ত্র বিষয়। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদিগের ইহা একটি বিশেষ মত।

সাম্যস্পন্দন যখন কণ্ঠ দিয়া বিকাশ পায়, তখন তাহাকে 'নাদ' বলে। নাদ-ই হইল ব্রহ্ম। স্বামিজীর কণ্ঠ হইতে আমি ক-এক বার এই নাদ নির্গত হইতে শুনিয়াছি। একটি ঘটনার বিষয় এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি।

লণ্ডনে রাত্রিতে রাজযোগের বক্তৃতা হইতেছিল। বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। ঘরের মেঝেতে গালিচা ও নরম স্প্রিং-এর সব চেয়ার পাতা। দেড় শত হইতে দুই শত বিশিষ্টঘরের স্ত্রী-পুরুষ ভাল ভাল পোশাক পরিয়া তাহার উপর বসিয়া বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। ইংরেজীতে বক্তৃতা হইতেছিল। সকলে একমনে নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিতেছিলেন। স্বামিজী সাধারণ-ভাবে বক্তৃতা দিয়া যাইতেছিলেন। মুখের ভাব তখন সাধারণ ছিল। সহসা তাঁহার মুখের সাধারণ ভাব বদলাইয়া স্নিগ্ধ অথচ দুষ্প্রেক্ষ্য ভাব হইয়া গেল। চোখের দৃষ্টি অন্য প্রকার হইল। তিনি হাত দুটি তুলিয়া যেন আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার দেহ হইতে এক নূতন ব্যক্তি আবির্ভূত হইল। অল্পক্ষণ বিরামের পর তাঁহার কণ্ঠ হইতে সাম্যস্পন্দনযুক্ত নাদ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সংস্কৃতে তিনি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ঃ

> "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
> মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
> মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
> মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
> মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
> মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥"†

† মধু বাতা ঋতায়তে (মধুর বাতাস বহিতেছে); মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ (সিন্ধুসকল,

এক একবার একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে ঊর্ধ্বদিকে কি যেন প্রত্যক্ষ করিয়া, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া, বিভোর হইয়া যাইতে লাগিলেন, ও পুনরায় বলিতে লাগিলেন। এইরূপে, স্বস্তিবাচনটি উচ্চারণ করিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিল। স্বামিজীর সমস্ত স্নায়ুপুঞ্জ একেবারেই পরিবর্তিত হইয়া গেল। নূতন এক প্রকারের মানুষ তিনি যেন হইয়া গেলেন। তিনি যেন জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এমন কি, যেন সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ বা কেন্দ্রীয় শক্তিস্বরূপ হইলেন; ঠিক যেন সেই অশরীরী সাম্যস্পন্দন-কেন্দ্র হইতে এই সৃষ্টি উদ্ভূত হইয়াছে! দেহজ্ঞান বা খণ্ডজ্ঞানের ভাব তখন তাঁহার কিছুই ছিল না। দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীতে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। স্বস্তিবাচনটি সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হইতেছিল, এবং কেহই তাহার অর্থ জানিতেন না। কিন্তু, যেমনই স্বস্তিবাচনটি বা নাদ স্বামিজীর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল, অমনি চকিতের ভিতর সকলেই অভিভূত হইয়া নিজ নিজ চেয়ার পিছনের দিকে সরাইয়া দিলেন, এবং জানু পাতিয়া বসিয়া, মাথা নীচু করিয়া দু-হাত জোড় করিয়া

অর্থাৎ নদীসকল মধু ক্ষরণ করিতেছে); মাধ্বীঃ নঃ সন্ত ওষধীঃ (আমাদের ওষধী-লতাসকল মধুময়ী, অর্থাৎ অমৃতস্রাবিণী হউক)।

মধু নক্তম্ উত উষসঃ (রাত্রিসকল এবং প্রভাতসকল মধুময় হউক); মধুমৎ পার্থিবং রজঃ (পৃথিবীস্থ ধূলিকণাসকলও যেন মধুময় হয়); মধু দ্যৌঃ অস্তু নঃ পিতা (হে পিতঃ, আমাদের আকাশ মধুস্রাবী হউক; কিংবা আমাদের স্বর্গস্থিত পিতৃপুরুষগণ মধুময়, অর্থাৎ আনন্দময় হউন)।

মধুমান্ নঃ বনস্পতিঃ (আমাদের বৃক্ষ মধুমান্, অর্থাৎ মধুর ফলপ্রসবী হউক); মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ (সূর্য মধুর কিরণবর্ষী হউক); মাধ্বীঃ গাবঃ ভবন্তু নঃ (আমাদের গাভীসকল মধুস্রাবিণী হউক)।

বৈদিক ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্।

আশীর্বাদ লইতে লাগিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ, যেন স্বামিজী ব্যতীত ঘরে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। সূক্তের অর্থাৎ শ্লোকের প্রত্যেক শব্দ, মাত্রা, যতি ও ছন্দ, সমস্তই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছিল। নাদ বা সাম্যস্পন্দন ঠিক যেন ঘরের হাওয়ার ভিতর দুলিয়া দুলিয়া ফিরিতে লাগিল। ইহা এত আশ্চর্য বিষয় ও এত উচ্চ অবস্থার কথা যে, ভাষা দিয়া বর্ণনা করা যায় না। ইহা হইল প্রত্যক্ষ বা জীবন্ত শক্তি। কেহই স্বস্তিবাচনটির অর্থ জানিতেন না; কিন্তু নাদ বা সাম্যস্পন্দনের এমনই প্রভাব বা শক্তি, যেন শ্রোতৃবৃন্দকে বা দেহগুলিকে বলিল, "উচ্চ আসনে বসিয়া থাকিবার সময় নয়, সকলে এই বাণীর কাছে নত হও, মাথা নত করিয়া থাক।" নাদ যেন সহসা দেহগুলিকে উলটাইয়া ফেলিয়া দিল। স্বামিজীর পূর্ব অবস্থা আর ছিল না—স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র দৃষ্টি, স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। তাহার পর চিত্ত নামিয়া আসিলে, তিনি সাধারণভাবে ইংরেজীতে স্বস্তিবাচনটির অর্থ বুঝাইয়া দিলেন—Blissful is the air. Blissful is the water of the river ইত্যাদি।

ইহাকেই বলে 'নাদব্রহ্ম' বা 'সাম্যস্পন্দন'। পরমহংস মশাই-এর ভিতর এই ভাবটি অনেক বার দেখিয়াছি। উচ্চ অবস্থার সাধক বা সিদ্ধ পুরুষগণের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ।

নির্বিকল্প সমাধিতে

দেখিতাম যে, পরমহংস মশাই সাধারণভাবে কথা কহিতেছেন, সহসা তাঁহার দেহের পরিবর্তন হইয়া যাইল! এই পরিবর্তন এত দ্রুত গতিতে হইত যে, শ্রোতৃগণ বা দর্শকগণ সেই গতির অনুসরণ করিতে পারিত না। অবশেষে, তিনি স্থির ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইলেন; হাতের নাড়ীর চলাচল বন্ধ হইয়া

যাইল; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইল এবং শ্বাসও স্তম্ভিত হইয়া যাইল। এইরূপ অবস্থা বহু বার দেখিয়াছি। এমন কি, একজন ডাক্তার পরমহংস মশাই-এর চোখে আঙুল দিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহাতে সংজ্ঞা বা বেদনা হয় কিনা। অবশ্য, সেই অবিবেচক ডাক্তারকে সকলে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

য়ুরোপীয় শারীরবিজ্ঞানে বলা হয় যে, হৃৎপিণ্ড, শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি হইল স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্র—Automatic organ, অর্থাৎ, ইচ্ছা করিয়া ইহাদিগের গতিরোধ করা যায় না। কিন্তু এ স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্রও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে; কোনো ক্রিয়াই থাকিতেছে না।

পরমহংস মশাই-এর এইরূপ নিস্পন্দ অবস্থা বা সমাধি উপর্যুপরি হইত। ইহার কারণ নির্দেশ করিতে হইলে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত অনুযায়ী বলিতে হয় যে, স্থূল-স্নায়ু-প্রক্রিয়া এক প্রকার এবং তাহার অভ্যন্তরস্থিত সূক্ষ্ম-স্নায়ুর প্রক্রিয়া আর এক প্রকার বা ঠিক বিপরীত প্রকার। ইহাই হইল বিপরীত গতিবাদের নিয়ম। স্থূল-স্নায়ুর যেমন বহির্মুখী বিকাশ হইবে, সূক্ষ্ম-স্নায়ুরও সেইরূপ অন্তর্মুখী বিকাশ হইবে; কিন্তু এই বিকাশ স্থূল-স্নায়ুর বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী হয় না। এইরূপ, ক্রমে, অতিসূক্ষ্ম-স্নায়ুর বা মহাকারণ-স্নায়ুর প্রক্রিয়া হইবে। এই অবস্থায় বহির্মুখী বা অন্তর্মুখী বলিয়া কোনো পার্থক্যদ্যোতক শব্দ প্রয়োজ্য হয় না। কারণ, স্নায়ু দিয়া যে শক্তি প্রধাবিত হয় তাহাকে 'মন' বলে; এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের স্নায়ু দিয়া যেরূপ শক্তি প্রধাবিত হইবে, মন, চিন্তাশক্তি, দর্শন, জ্ঞান বা উপলব্ধি, সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারের হইবে।

লণ্ডনে রাত্রে বক্তৃতাকালে স্বামিজী একবার 'সমাধি'-র বিষয়

বলিতে বলিতে নিজে সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। গুডউইন[১] টেবিলে বসিয়া 'ক্ষিপ্র-লিপি'-তে সকল কথা লিখিতেছিল। সে সহসা কাগজ ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া স্বামিজীকে দেখিতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দও তাঁহাদের চেয়ার ফেলিয়া স্বামিজীর কাছে গিয়া দেখিতে লাগিলেন।—স্বামিজীর কোনো শ্বাসও নাই, কোনো স্পন্দনও নাই; নিস্পন্দ পুত্তলিকার মতো তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। ক-এক মিনিট পর, পুনরায় শ্বাস ফেলিয়া, যেখান পর্যন্ত বক্তৃতা হইয়াছিল ঠিক তাহার পরের ছত্র হইতে বক্তৃতা দিয়া যাইতে লাগিলেন; ভাব, ভাষা ও ব্যাকরণের কোনোই ত্রুটি হইল না। স্বামিজীর এইরূপ সমাধি-অবস্থা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

স্নায়ু-বিজ্ঞান হইল রাজযোগের অন্তর্গত। কিন্তু হঠ-যোগীরাও এই স্নায়ু-বিজ্ঞানের বহু প্রকার প্রক্রিয়া জানেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে ভূকৈলাস রাজবাটীতে এক হঠযোগীকে দেখা গিয়াছিল। তিনি ভূগর্ভে এক মন্দিরের ভিতর বহু কাল যাবৎ, সম্ভবতঃ, ক-এক শত বৎসর উপবিষ্ট ছিলেন। যখন পোর্ট ক্যানিং-এর রেলপথ খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেই মন্দির বাহির হয়, তখন সেইখানে এই হঠযোগীকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিলে, বয়স অনুমান বত্রিশ বৎসর বলিয়া বোধ হইত। কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি ছিল। এই হঠযোগীর গায়ে আগুন পুরিয়া দেওয়াতেও তাঁহার কোনো সংজ্ঞা হয় নাই। এই হঠযোগীর ব্যাপার কলিকাতার তখনকার অনেকেই জানিতেন। আমাদের বাড়ির সকলে এই হঠযোগীকে দেখিতে যাইতেন, কিন্তু আমার তখন অল্প বয়স বলিয়া তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইতেন না।

১ শ্রীযুক্ত জে. জে. গুডউইন, স্বামী বিবেকানন্দের পরম অনুরক্ত য়ুরোপীয় শিষ্য

অপর একটি উদাহরণও এ স্থলে দেওয়া যাইতে পারে—বাবা হরিদাসের কথা। বাবা হরিদাস হঠযোগী ছিলেন। এক বার তিনি মহারাজ রঞ্জিৎ সিং-এর রাজ্যে উপস্থিত হন। কোনো ব্যক্তি তাঁহার যৌগিক প্রক্রিয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করায়, বাবা হরিদাস মহারাজ রঞ্জিৎ সিং-এর আদেশক্রমে, যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি দেহের সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন বাবা হরিদাসকে পাথরের সিন্দুকের ভিতর পুরিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইল, এবং তাহার উপর গম বুনা হইল। গম পাকিলে, কাটিয়া লওয়া হইল। তাহার পর, সিন্দুক উঠানো হইলে খুলিয়া দেখা গেল যে, বাবা হরিদাস পূর্বের মতো শায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। তিনি উঠিয়া সাধারণ লোকের মতো কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি প্রায় ছয় মাস কাল ঐরূপ প্রোথিত অবস্থায় ছিলেন।

ক-এক বৎসর পূর্বে, কলিকাতায় ক-এক জন হঠযোগী অল্পবিস্তর হঠযোগের প্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন। হঠযোগীরা বলিয়া থাকেন যে, পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত অভ্যন্তরস্থ করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এখানে হঠযোগীদিগের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, স্নায়ু-বিজ্ঞানের কথা বলাই উদ্দেশ্য। পরমহংস মশাই কঠোর তপস্যা করিয়া স্নায়ুসমূহ এরূপ সঞ্চালিত করিতে পারিতেন যে, নিজ ইচ্ছামতো স্নায়ুর গতি ও প্রক্রিয়া পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইতেন। এইজন্য, তিনি যখন অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে চলিয়া যাইতেন, মহাকারণ বা মহাব্যোমে যাইতেন, তখন স্থূল-স্নায়ুর কোনোরূপ প্রক্রিয়াই থাকিত না, এবং দেহস্থিত যন্ত্রাদিরও কোনো ক্রিয়া হইত না। এইজন্য, তিনি নিস্পন্দ হইয়া যাইতেন বা সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন।

বিভ্রান্ত অবস্থায়

পরমহংস মশাই-এর এক প্রকার বিভ্রান্ত অবস্থা অনেক বার দেখিয়াছি। ইহা সাধারণ বিভ্রান্তচিত্ততা নহে, কিন্তু অতি উচ্চ অবস্থা। এত সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে তাঁহার চিৎ-শক্তি যাইত যে, সেখান হইতে স্থূল-স্নায়ুতে সেই শক্তিকে ফিরাইয়া আনা কষ্টকর। এইজন্য, এইরূপ বিভ্রান্ত অবস্থা হইত। চিৎ-শক্তি যখন অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে গমন করিয়া স্থূল-স্নায়ুর দিকে নামিতে থাকে, তখন উহা কোন্ শ্রেণীর স্নায়ুর ভিতর প্রধাবিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, হয়তো কর্ণ দিয়া দেখিবার প্রয়াস পায়, এবং চক্ষু দিয়া শুনিবার প্রয়াস পায়। মস্তিষ্কে দৃষ্টি ও শ্রবণের স্নায়ুকেন্দ্র পরস্পর সন্নিকট ও সংশ্লিষ্ট। এইজন্য, শক্তি এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে চলিয়া যায়; তাহার পর, কিঞ্চিৎ বিরামের পর, অভীষ্ট স্নায়ুতে শক্তি প্রধাবিত হয়। সমাধি-অবস্থার পর যখন স্থূল দেহে চিৎ-শক্তি প্রত্যাবর্তন করে, তখন ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে।

ভাব দর্শনে

দর্শনশাস্ত্রের বা রাজযোগের সূত্র হইতেছে--The first impression of truth comes in the form of pictures.—অর্থাৎ, 'সত্য' প্রথমে চিত্ররূপে সম্মুখে আসিয়া থাকে।

পরমহংস মশাই যখন মনকে অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে লইয়া যাইতেন, তখন তাঁহার নিকট জগৎ অন্যরূপে প্রতীয়মান হইত। এইজন্য, অতি জটিল প্রশ্ন করিলেও তিনি নূতন সত্য বা ভাব সম্বন্ধে অনবরত বলিয়া যাইতেন। এ বিষয়ে একটি গল্প বলিতেছি। গল্পটি আমি চুনীলাল বসুর[১] কাছে শুনিয়াছিলাম।

১ অপর নাম, নারায়ণ

একবার শিখ সেপাইরা পরমহংস মশাইকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মশাই, আমরা সেপাইগিরি করি, মারপিট করাই আমাদের ব্যবসা। সরকারী হুকুমে আমাদের যাকে গুলি মারতে বলবে, তাকেই মারতে হবে। এরূপ অবস্থায় আমরা সংসারে কি রকমে থাকবো?" পরমহংস মশাই এই প্রশ্নটির বিষয় চিন্তা করিতেই দেখিতে পাইলেন যে, সম্মুখে একটি ঢেঁকি আসিয়া ধান ভানিতে লাগিল। পরমহংস মশাই সেপাইদের বলিলেন, "দেখ, ঢেঁকি যেমন অনেক মাথা নাড়ে, অনেক উঁচু-নীচু ওঠে, গড়ের ভিতর অনেক ধান ভানে, অনেক কাজ করে, কিন্তু দু-পাশের দুটো কাটি দুটো খোঁটাতে আটকানো থাকে, তাতে কোনো ব্যতিক্রম হয় না—ঠিক এইভাবে মন রেখে কাজ করো।" এই উদাহরণ শুনিয়া শিখেরা খুব আনন্দ করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে, এইরূপ উদাহরণ তাহারা কখনো শুনে নাই।

চিন্তা বা তর্ক-যুক্তি স্থূল অবস্থায় আবশ্যক হয়। একটি মন বলিতেছে—'হাঁ', অর্থাৎ সম্মতি দিতেছে, আর একটি মন বলিতেছে—'না', অর্থাৎ আপত্তি তুলিতেছে। ইহা হইল দ্বন্দ্ব অবস্থা। এরূপ স্থলে তর্ক-যুক্তির আবশ্যক হয়, কারণ, অনিশ্চিত ভাব বা সন্দেহ রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় কখনই কোনো নির্ধারিত মীমাংসা হয় না। স্থূল-স্নায়ুর প্রক্রিয়ায় অনিশ্চিত ভাব থাকায় সন্দেহ ও দ্বিধা আসিয়া থাকে। ইহাই হইল তর্ক-যুক্তির কারণ। তর্ক-যুক্তি হইল নিম্ন স্তরের বিষয়। কিন্তু, সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা কারণ-স্নায়ু দিয়া চিৎ-শক্তি প্রধাবিত হইলে ভাবসকল বিগ্রহ বা মূর্তি ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। ইহা হইল 'ভাব-দর্শন'—Visualisation of ideas.

পরমহংস মশাই-এর কথায় তর্ক-যুক্তি থাকিত না। তিনি

স্পষ্টরূপে সকল ভাবই দেখিতেন এবং দৃষ্ট ভাবসমূহ ভাষা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু অনেক সময় ভাবগুলি এত সূক্ষ্ম, কারণ বা মহাকারণ স্নায়ুর অভ্যন্তরস্থিত শক্তি হইতে প্রতিবিম্বিত হইত যে, তিনি নিজে সেইগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তাহা বিকাশ করিতে পারিতেন না।

সাধারণতঃ, লোকে প্রথমে গ্রন্থাদি পাঠ করে, তাহার পর তর্ক-যুক্তি করে, অবশেষে মীমাংসায় আসিয়া থাকে এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা দর্শন করিতে প্রয়াস পায়। প্রচলিত-রূপে তর্ক-যুক্তি করিয়াই, সাধারণতঃ, লোকে ক্ষান্ত হয়, এবং মনে করে যে, এইরূপ করায় একটি বড় কাজ হইল। কিন্তু, দর্শনের কাছে এই সকল তর্ক-যুক্তি বালকোচিত চাপল্যের মতো বোধ হয়। Philosophy বা 'জ্ঞান-লিপ্সা' হইল গ্রীকদিগের ব্যবহৃত শব্দ। ভারতীয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ হইল—'দর্শন', অর্থাৎ, যাহা স্পষ্ট দেখা যায়। এইজন্য, কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিলেই বা তর্ক-যুক্তি করিলেই 'দর্শন' হয় না, বা 'দার্শনিক'-ও হওয়া যায় না। ভাবসমূহকে যিনি স্পষ্ট দেখেন, তিনিই 'দার্শনিক'। পরমহংস মশাই ছিলেন অতি উচ্চ অবস্থার দার্শনিক।

গুণাতীত অবস্থায়

'গুণ' আর 'বস্তু' কি?—গুণ হইল, যাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। এইজন্য, ইহা পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী। বস্তু হইল, যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এইজন্য, ইহা অপরিবর্তনশীল, নিত্য, শাশ্বত বা সনাতন। আমাদের যাহা কিছু 'জ্ঞান', তাহা শুধু গুণ সম্বন্ধে হইয়া থাকে। গুণের অপূর্ব অংশ হইল জ্ঞান। কিন্তু, গুণের অতীত এক অবস্থা আছে। এই অবস্থাকে পরমহংস মশাই 'বি-জ্ঞান'-এর অবস্থা বলিতেন।

এই অবস্থায় 'অতীন্দ্রিয় জ্ঞান' আসিয়া থাকে। সাধারণ লোকের জ্ঞান হইল—গুণ সম্বন্ধে; গুণাতীত অবস্থা সাধারণ লোকের উপলব্ধি হয় না।

গ্রন্থাদি পাঠ, তর্ক-যুক্তি, প্রভৃতি দিয়া যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে 'গুণবর্ধক জ্ঞান' বলে। জগতের চক্ষে গুণবর্ধক জ্ঞানই প্রধান বিষয়; আর, এইজন্যই, তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অবস্থায় বা কারণ-শরীরে মনকে লইয়া যাইলে 'গুণাতীত জ্ঞান' প্রতীয়মান হয়। এই গুণাতীত জ্ঞানের কাছে গুণবর্ধক জ্ঞান অতি সামান্য বিষয়। সাধারণ লোকে গুণবর্ধক জ্ঞান দিয়াই পরমহংস মশাই-এর সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে যাইত, এবং মনে করিত যে, পরমহংস মশাই একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, তাঁহাকে দুইটা প্রচলিত তর্ক-যুক্তি দিয়া শীঘ্রই অভিভূত করা যাইবে। কিন্তু, কারণ-শরীরে মনকে লইয়া যাইতে পারিলে যে গুণাতীত জ্ঞান আসিয়া থাকে, তাহা অনেকের জানা ছিল না। এই-জন্য, জগৎকে যে অন্য ভাবে দেখা যায়, তাহা অতি অল্প সময়ের ভিতরই পরমহংস মশাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি তর্ক-যুক্তি করিতেন না। তর্ক-যুক্তির উৎপত্তি হইল সন্দেহ হইতে, এবং সন্দেহেই উহার সমাপত্তি হয়। কিন্তু তিনি কারণ-শরীরে মনকে লইয়া যাওয়ায় ভাবগুলিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীকেও তাহা দেখাইয়া দিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার এক অতীব আশ্চর্য শক্তি।

শব্দ, ভাব ও শক্তিতে

পরমহংস মশাই-এর সমস্ত কথা কেহই মনে রাখিতে পারেন নাই, রাখা সম্ভবও নয়। কারণ, প্রথমে তিনি ভাষা ও শব্দ

দিয়া একটি উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিতেন; উপাখ্যানটি বলিবার অল্পক্ষণ পরেই, উহার ভিতর যে ভাবটি আছে, সেইটি তিনি স্বয়ং হইয়া যাইতেন বা উহার রূপ পরিগ্রহ করিতেন। তিনি যে সকল কথা বলিতেন, তাহা ঠিক যেন একটি জীবন্ত ভাব হইয়া সকলের সম্মুখে আসিতে থাকিত। তখন অনুভব করিতাম যে, ভাবও খণ্ড ও তুচ্ছ জিনিস। ভাবেরও বহু উর্ধ্বে, শক্তিতে, সকলের মনকে তিনি লইয়া যাইতেন। সে সময়ে কাহারো আর চিন্তা, তর্ক, যুক্তি, সন্দেহ, দ্বিধা, প্রভৃতি মনের ক্রিয়াসমূহ থাকিত না। সকলেই নিঝুম, নির্বাক্ ও নীরব; যেন, ভিন্ন জগতে ভিন্ন ক্ষেত্রে চলিয়া যাইত। 'হাঁ' বা 'না' বলিয়া কোনো শব্দও থাকিত না। সব এক হইয়া যাইত। সকলকে এক অসীম অনন্ত শক্তিতে তিনি লইয়া যাইতেন, যাহাকে বলে—মনটাকে সবিকল্প সমাধিতে লইয়া যাওয়া। শব্দ ও ভাব, পর পর অতিক্রম করিয়া, তিনি এক অসীম শক্তির সহিত মিশিয়া সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। এইজন্য তাঁহার ভাষা, শব্দ ও উপাখ্যান তত মনে রাখা যাইত না।

দেখিয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দও লণ্ডনে বক্তৃতাকালে প্রথমে একটি উপাখ্যান শুরু করিতেন; কিন্তু, অল্পক্ষণ পরেই, উপাখ্যানের ভিতর যে ভাবটি থাকিত, তাহা জাগ্রত করিতেন, এবং, অবশেষে, এক মহান্ শক্তিতে সকলের মনকে লইয়া যাইতেন। এইজন্য, বক্তৃতার তর্ক-যুক্তির দিকে কাহারো দৃষ্টি থাকিত না, এবং তাঁহার সকল কথাও কাহারো মনে থাকিত না।

শক্তি-সঞ্চারণকারী এইরূপ ব্যক্তি যে কত উচ্চ-অবস্থার মহাপুরুষ, বা এই শক্তিকেন্দ্র বা উৎসক্ষেত্র যে কত উচ্চ, তাহা অনুমান করা যায় মাত্র, কিন্তু মাপকাটি দিয়া পরিমাপ

করা যায় না। মাপকাটি দিয়া সাধারণ লোকের মনের অবস্থা পরিমাপ করা যায়, কিন্তু, এত উচ্চ অবস্থার মহাপুরুষের মনের অবস্থার বিষয় কোনো মাপকাটি দিয়া পরিমাপ করা যায় না; কারণ, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার মনের সকল প্রকার ক্রিয়াই একেবারে চলিয়া যায়। এইজন্য, শক্তিকেন্দ্র বা উৎসক্ষেত্র যে কত উর্ধ্বে, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না।

'ভাব' আর 'শক্তি' একই—এই যে দার্শনিক মত, এই তথ্যটি পরমহংস মশাই-এর জীবন দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। জগতে ইহা একটি নূতন ব্যাপার।

বিদেহ অবস্থায়

আমি নিরঞ্জন মহারাজের কাছে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি প্রথম অবস্থায় অফিসে চাকরি করিতেন। তিনি ক-এক বার দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংস মশাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক দিন পরমহংস মশাই তাঁহার জিহ্বায় কি লিখিয়া দিয়া জপ করিতে বলেন। তখন তাঁহার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হইল না। পরে, বাড়ি আসিলে তিনি দেখেন যে, দেহের অভ্যন্তরে অনবরত জপ চলিতেছে। ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া চোখ বন্ধ করিয়া শুইলেও চোখের উপর যেন জ্যোতির্বিন্দুসমূহ নড়িতেছে। স্নান-আহার, কাজ-কর্ম করা, প্রভৃতি সকল অবস্থার মধ্যেই জপ চলিতেছে। এইরূপ জপ তিন দিন তিন রাত্রি হইতে লাগিল। তিনি জপ-ধ্যানে অনভ্যস্ত ছিলেন, এইজন্য ভয় পাইয়া মনে করিলেন যে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। অবশেষে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংস মশাইকে বলিলেন, "মশাই, এ কি করেছেন? আমি যে ঘুমুতে পারি না, অন্য কোনো চিন্তা করতে পারি

না।" পরমহংস মশাই সেই শক্তি তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "এ-কে বলে—অজপা জপ।"

এই 'অজপা জপ' কি? —প্রথমতঃ, সাধক জিহ্বা দিয়া জপ করে, তাহার পর মন দিয়া জপ করে। ইহা হইল সাধারণ-ভাবে জপ করা বা জপ করিবার চলিত প্রথা। কিন্তু, মন বা চিৎশক্তি যখন খুব গভীর স্নায়ুতে চলিয়া যায়, তখন প্রথম যে শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল বা যে Impetus দেওয়া হইয়াছিল, সেই প্রথম পরিচালিত বা প্রধাবিত শক্তি, নিজ শক্তিবলে উদ্বুদ্ধ হইয়া অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে নিরন্তর সমভাবে প্রধাবিত হয়। এইরূপ অবস্থায়, বাহ্যিক স্নায়ু বা বাহ্যিক মন, অবস্থা অনুযায়ী সাময়িকভাবে নানা কার্য করিয়া থাকে; কিন্তু, অভ্যন্তরীণ স্নায়ু বা অভ্যন্তরীণ মনও ভিন্ন গতিতে ভিন্ন চিন্তা ও ভিন্ন ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহা হইল, মনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা—Bifurcation of mind.

স্বামিজী লণ্ডনে রাজযোগের বক্তৃতাকালে এই বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই অবস্থায় স্থূল-স্নায়ুক্রিয়া এক প্রকার হইবে, এবং অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুক্রিয়া আর এক প্রকার হইবে; অর্থাৎ, সাময়িকভাবে নিজেকে বিদেহ হইয়া যাইতে হয়। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম-মন বা সূক্ষ্ম-স্নায়ুপ্রসূত শক্তি স্থির দ্রষ্টারূপে অবস্থান করে। এইজন্য, তখন সূক্ষ্ম-মন জগৎকে অন্য প্রকারে দেখে বা ভাবলোকে অবস্থান করিয়া ভাবসমূহকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে।

এই দর্শন হইল—স্থির, নিশ্চল ও গম্ভীর। অপর কথায়, ইহাকে বিভোর বা তন্ময় অবস্থা বলা হইয়া থাকে। উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা ইহা নয়। উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ততা হইল বিকৃত অবস্থা—স্থূল-স্নায়ুর গতিরোধ হওয়ায় চিৎ-শক্তি বিভিন্ন শাখায় ও বিভিন্ন স্রোতে প্রধাবিত হইয়া থাকে; ইহা হইল স্নায়ু-

দৌর্বল্যের চিহ্ন। কিন্তু, মনকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া চিন্তা-স্রোতকে জাগ্রত করা বা বিদেহ হওয়া হইল অতি উচ্চ অবস্থার কথা। মন যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়, তখন জগতের সম্পর্কসমূহ স্থূল-স্নায়ু দিয়া পূর্বে যেরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেইরূপ হয় না; তখন নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আসিয়া থাকে, এবং জগতের বস্তুসমূহের মধ্যে নূতন প্রকার সম্পর্ক স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহা হইতে আরো সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে মনকে তুলিলে, বাহ্যিক বিকাশ করিবার শক্তি বা স্থূল-স্নায়ুপ্রক্রিয়া-সমূহ ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া, অবশেষে, বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন খণ্ড চিন্তাশক্তি বা খণ্ড রূপসমূহ বিলুপ্ত হইয়া একীভূত হইয়া যায়।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে এক রাত্রে বলিয়াছিলেন, "I meditated even on the tips of my fingers."—অর্থাৎ, আমি আঙুলের অগ্রভাগ দিয়াও জপ করিয়াছি। সাধারণ লোকে মনে করিবে যে, জপ জিহ্বা দিয়া হয়, মন দিয়া হয়, কিন্তু, আঙুলের অগ্রভাগ দিয়া জপ হয়—ইহা কিরূপে সম্ভব?

এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে বহুবিধ দার্শনিক মত ও প্রক্রিয়া জানা আবশ্যক। প্রথম প্রশ্ন হইল, 'মন' কাহাকে বলে?—য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে 'মন' যে কি বস্তু বা পদার্থ, তাহা কিছু নির্ণয় করা হয় নাই। এইজন্য, বিভিন্ন য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু স্নায়ু-বিজ্ঞান অনুযায়ী চিন্তা করিলে ইহা বলিতে পারা যায়—Nerves are supposed to be hollow canals. And the finest atomic particles inside the hollow canals, by constant oscillation or combustion, give out the imbedded energy, which, in its

onward course, forms a current called 'mind'.—অর্থাৎ, স্নায়ুসমূহ ফাঁপা বা শূন্যগর্ভ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু, একেবারে শূন্যভাব প্রকৃতির বিরোধী; এইজন্য, এই স্নায়ু বা নালীসমূহের ভিতর পরমাণুসমূহ—অণু, দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু-সকল অবস্থান করে। কিন্তু, পরমাণু কখনো স্থির, নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে পারে না, এইজন্য, উহা নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে। পরমাণুর এই স্পন্দনজনিত হউক, বা দহনজনিত হউক, উহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। পরমাণুপ্রসূত এইরূপ শক্তিধারা এক বা ততোধিক সূক্ষ্ম স্নায়ুপুঞ্জ দিয়া সঞ্চালিত ও প্রধাবিত হইলে সমষ্টিভাবে এক শক্তিরেখা উদ্ভূত হয়। ইহাকেই 'মন' বলা হয়। রাজ-যোগে চিত্ত-কে মন-উপাদান—Mind-stuff বলা হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, মনের অবস্থান কোথায়?—প্রাচীন য়ুরোপীয় মত হইল, মন মস্তিষ্কে থাকে। কাহারো মতে, হৃদয়ে বা হৃৎপিণ্ডে থাকে,—ইত্যাদি বহুবিধ মত আছে। কিন্তু, স্নায়ু-বিজ্ঞান দিয়া পর্যালোচনা করিলে বেশ দেখা যায় যে, প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতরেই একই প্রক্রিয়া হইতেছে। যেমন, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার (বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মেরু-দণ্ডমধ্যে সুষুম্না) প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, তেমনই অন্যান্য প্রত্যেক স্নায়ুরও প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। স্থূল-স্নায়ু দিয়া শক্তি সঞ্চালিত হইলে স্থূল বা নিম্ন চিন্তা হয়; এবং সূক্ষ্ম বা উচ্চতর স্নায়ু দিয়া শক্তি সঞ্চালিত হইলে, উচ্চতর চিন্তা হইয়া থাকে। এইজন্য, স্নায়ুপুঞ্জকে স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রভৃতি নানা প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইলে স্পষ্ট বুঝা যায়—A mind everywhere, the mind nowhere. অর্থাৎ, মন সাধারণভাবে দেহের সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত, কোনো

বিশেষ স্থানে ইহার অবস্থিতি নাই। এইজন্য আঙুলের অগ্রভাগেও মন আছে; এবং, যদি অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুকে প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত করা যায়, তাহা হইলে আঙুলের অগ্রভাগ দিয়াও জপ বা চিন্তা করা যাইতে পারে। স্নায়ু-বিজ্ঞানের এই মত প্রচলিত য়ুরোপীয় দার্শনিক মত হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্যই, স্বামিজী গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "I meditated even on the tips of my fingers."—আমি আঙুলের অগ্রভাগ দিয়াও জপ করিয়াছি। পরমহংস মশাই যে অজপা জপের কথা বলিয়াছিলেন, ইহা তাহাই। অতি গভীর স্তরের সূক্ষ্ম-স্নায়ুসমূহ সঞ্জীবিত করিতে পারিলে, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া জপ বা চিন্তা করিতে পারা যায়। রাজযোগ জগৎকে এই নূতন ভাব দিতেছে। এই সকল হইল গভীর চিন্তা করিবার বিষয়; শব্দ-বিন্যাস বা তর্ক-যুক্তির বিষয় নহে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আমরা কি প্রকারে চিন্তা করিয়া থাকি? —নিম্ন স্তরে বা সাধারণ অবস্থায় আমরা স্থূল-স্নায়ু দিয়া চিন্তা করি, এবং মস্তিষ্কে সেই শক্তি প্রধাবিত হওয়ায়, অল্পক্ষণের ভিতর শ্রান্ত হইয়া পড়ি এবং মস্তিষ্কের ভিতর নানা প্রকার যন্ত্রণা আসিয়া থাকে। ইহা হইল, প্রচলিত প্রথায় চিন্তা করা। মস্তিষ্কের পরমাণুসমূহ বা 'গ্যাংগ্লিয়নিক সেল'-সমূহ যাহা দেখিতে গুগলি বা বাংলা পাঁচের মতো, ধূসর বর্ণ, সেগুলি নষ্ট হইয়া যায়। স্থূল-স্নায়ুর পরমাণুসকল ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, আমাদিগকে বহির্দেশ হইতে পুষ্টিকর ও উত্তেজক আহারসামগ্রী শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এই সকল বাহ্যিক পরমাণু—আহার্য, জল ও বায়ু, এই তিন বস্তুর পরমাণু-সকল শরীরের বিনষ্ট পরমাণুসকলের স্থান পুনরায় অধিকার করে। পূর্ব পরমাণুসকল নষ্ট হইয়া অনবরত প্রস্রাব হয়;

কখনো বা গায়ে ঘাম হয়, এবং কখনো কখনো মুখ দিয়াও লালা নির্গত হয়। আহার্য বস্তু বা সংরক্ষণশীল (Preservative) এবং রক্ষণশীল (Protective) পদার্থসমূহের পরমাণুসকল নষ্ট পরমাণুসমূহের স্থান অধিকার করিয়া শরীরকে সমভাবে ও সতেজভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখিয়া দেয়। স্থূল-স্নায়ু দিয়া চিন্তা করায় এইরূপই হইয়া থাকে।

আর এক প্রকার চিন্তাধারা আছে। মন বা চিৎ-শক্তি যখন সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে যায়, এবং সূক্ষ্ম-স্নায়ু হইতে কারণ-স্নায়ুতে প্রধাবিত হয়, তখন উহা স্থূল-স্নায়ুর আবরণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূল-স্নায়ুপুঞ্জ কেবল আবরণস্বরূপ হইয়া থাকে বা বাহ্যিক রক্ষণশীল আয়তনস্বরূপ প্রতীয়মান হয়; অভ্যন্তরস্থিত সূক্ষ্ম-স্নায়ুপুঞ্জ বা কারণ-স্নায়ুপুঞ্জ, স্থূল-স্নায়ুপুঞ্জ হইতে একেবারেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়—এক স্তরের স্নায়ুপুঞ্জ অপর স্তরের স্নায়ুপুঞ্জের সহিত সংলগ্নও বটে আবার অসংলগ্নও বটে, ঠিক যেন একটি সূক্ষ্ম ব্যক্তি মাংস বা স্নায়ুর আবরণীর ভিতর বাস করিতেছে।

পরমহংস মশাই এ বিষয়ে উদাহরণ দিতেন: যেমন, সুপারি। শুখাইয়া যাইলে উপরকার খোলাটার ভিতরে তাহা থাকে, ঝনঝন করিয়া আওয়াজ হয়। সুপারিটিকে রক্ষার জন্য উপরকার খোলাটির আবশ্যক আছে।

আর একটি উদাহরণ তিনি দিতেন: যেমন চাল ও চালের তুষ। উপরকার খোলা বা তুষ বা আবরণী না থাকিলে ভিতরকার চালটি থাকিতে পারে না। উপরকার তুষটি থাকায় ভিতরকার চালটি রক্ষা পাইতেছে। এবং, যদিও তুষ হইতেই প্রথম অবস্থায় চালের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ধানটি পাকিয়া গেলে তুষ ও চাল আলাদা হয়। তুষটি

চালের সংলগ্নও বটে, অসংলগ্নও বটে। উদাহরণ দুইটি অতি সুন্দর।

চিৎ-শক্তি যখন সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে যায়, তখন বাহ্যিক স্থূল-স্নায়ুসকল নিমিত্তমাত্র হইয়া থাকে। স্থূল অবস্থায় মস্তিষ্ক, হাত, পা, আঙুল প্রভৃতি পৃথক্ ও স্বতন্ত্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, কারণ, স্থূল-স্নায়ুসকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিবর্ধিত হইয়াছে এবং ভিন্ন প্রকারে সক্রিয় হইয়া থাকে; কিন্তু, সূক্ষ্ম বা কারণ অবস্থায় এইরূপ কোনো পার্থক্য থাকে না। মস্তিষ্কের ভিতর যে সকল সূক্ষ্ম-স্নায়ু আছে, আঙুলের অগ্রভাগেও সেই সকল সূক্ষ্ম-স্নায়ু আছে—সর্বত্রই এক প্রকার সূক্ষ্ম-স্নায়ু।

সাধারণভাবে চিন্তা করিতে হইলে স্থূল-স্নায়ু দিয়া চিন্তা করা আবশ্যক, কারণ তখন আমরা খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তা করি। বিশ্লিষ্ট ভাবে চিন্তা করা হইল স্থূল-স্নায়ুর প্রক্রিয়া। এইজন্য, আমরা সাধারণতঃ মস্তিষ্ক দিয়া চিন্তা করি, হাত-পা ইত্যাদি দিয়া চিন্তা করি না। কিন্তু সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা কারণ-স্নায়ুতে যাইলে, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতর সমভাবে সূক্ষ্ম-স্নায়ু থাকায়, চিৎ-শক্তির প্রবাহ সর্বত্র সমভাবে হইয়া থাকে। এইজন্য বলা হয়—Think not through your brain but through your nerves : Bring down the ideas to your nerves : Be saturated with the ideas.—অর্থাৎ, স্নায়ু দিয়া চিন্তা করিবে; মস্তিষ্ক দিয়া চিন্তা করিবে না, বা ভাবসকলকে স্নায়ুর ভিতর আনয়ন করো; ভাবে তন্ময় হইয়া যাও।

এইরূপ সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে অবস্থান করার নাম হইল বিদেহ-অবস্থা বা জীবন্মুক্ত-অবস্থা। স্থূল-স্নায়ুতে থাকিলে যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে, কারণ, স্থূল

পরমাণুপুঞ্জ নষ্ট হওয়ায় সেগুলির স্থান পরিপূর্ণ করিবার জন্য বাহ্যিক উপকরণের আবশ্যক হয়, সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে যাইলে তেমন ক্লান্তি ইত্যাদি কিছু থাকে না, স্নায়ু-প্রক্রিয়া অন্য প্রকার হয়। এইজন্য, পরমহংস মশাই নানা শ্রেণীর লোকের সহিত নানা বিষয়ে নিরন্তর কথা কহিয়া যাইতে পারিতেন। শ্রোতারা ক্লান্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহার কোনো ক্লান্তি বা বৈষম্য হইত না। বিদেহ-অবস্থা বা জীবন্মুক্ত-অবস্থা কাহাকে বলে, সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে অবস্থান যে কি ব্যাপার, পরমহংস মশাই-এর বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি যে কত দূর সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে উঠিতেন, তাহা সাধারণ অবস্থায় বুঝা যাইতে পারে না। তিনি দেহের ভিতর থাকিতেন, কিন্তু দেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, "প্রথম মনে করো, নিজের সম্মুখে বসিয়া আছ—নিজেকে দুই ভাগ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছ, নিজেই যেন নিজের প্রতীক, নিজেই নিজের দর্পণস্বরূপ হইয়াছ। প্রথম, চরণ হইতে দেখিতে আরম্ভ করিতে হয়; তাহার পর, ক্রমে ক্রমে, বক্ষঃস্থল, হস্ত ও গ্রীবায় চিত্তবৃত্তি সংযোগ করিতে হয়; অবশেষে, মুখ ও চক্ষুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ করিলে, অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে চিত্তবৃত্তি প্রধাবিত হয় এবং স্থূল দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া অশরীরী অবস্থা বা বিদেহ-অবস্থা লাভ হয়।"

অপর একটি কথা স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "ভাবিবে যে, নিজে মরিয়া পড়িয়া আছ, আর, নিজেই দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছ। শববাহকেরা তোমার মৃত দেহটি লইয়া যাইল; দেহটিকে চিতায় স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া আছে; মৃত দেহ ভস্ম হইয়া যাইল;—নিজেই তাহা

দেখিতেছ। এইরূপ ধ্যান করিলে সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে বা বিদেহ-অবস্থায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে।"

দূর হইতে দর্শনে ও শ্রবণে

পরমহংস মশাই-এর দূর হইতে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি করিবার শক্তি প্রবল ছিল। তাঁহার এই শক্তি অনেকেই দেখিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু, এ স্থলে দু-একটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

স্বামী সারদানন্দের নিকটে শুনিয়াছিলাম যে, শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে পরমহংস মশাই নাকি একটি জ্যোতি বা আলোক-রেখা দ্বারা সুরেশ মিত্তিরের বাড়ি দুর্গাপূজা দেখিয়াছিলেন।

পরমহংস মশাই যে আমার মা'র জন্য গরদের কাপড় ও মিছরির থালা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।†

সাধারণতঃ, আমরা কতিপয় স্থূল-স্নায়ু দিয়া দর্শন ও শ্রবণ করিয়া থাকি। ইহাই হইল সাধারণভাবে দর্শন ও শ্রবণ করিবার উপায়। এইজন্য, বিশেষভাবে কোনো বস্তুকে দর্শন করিতে হইলে চোখে জোর দিতে হয়, তাহা হইলে বস্তু কিঞ্চিৎ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আরো বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে হইলে, আমরা যে পরিমাণে চোখের স্নায়ুতে শক্তি প্রয়োগ করি, দৃষ্টিও সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। এ সকলই হইল স্থূল-স্নায়ুপ্রক্রিয়া। কিন্তু, যদি অভ্যাস করিয়া, অর্থাৎ, জপ-ধ্যান ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা মুমূর্ষু বা সুষুপ্ত সূক্ষ্ম-স্নায়ুসমূহকে সঞ্জীবিত বা জাগ্রত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, যে পরিমাণে সূক্ষ্ম-স্নায়ুসমূহ জাগ্রত

† পৃষ্ঠা ৩৯ দ্রষ্টব্য

হইবে, স্নায়ুপ্রধাবিত শক্তিও সেই পরিমাণে দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে। কারণ, নিয়ম হইতেছেঃ সমজাতীয় স্পন্দন সমজাতীয় স্পন্দনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে—Similar vibration catches similar vibration. বস্তুর ত্বক্-শক্তি বা Peripheral energy যে প্রকারে স্পন্দিত হইতেছে, চোখের স্থূল-স্নায়ুসমূহও সেই প্রকারে স্পন্দিত হইতেছে। সেইজন্য, চোখের স্নায়ুর স্থূল-স্পন্দন দ্রব্যের স্থূল-স্পন্দনকে আকর্ষণ করিতেছে বা উহার সহিত একীভূত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা অতিসূক্ষ্ম-স্নায়ু যখন প্রকম্পিত হয়, তখন তাহা হইতে প্রসূত সূক্ষ্ম-স্পন্দন বা অতিসূক্ষ্ম-স্পন্দন বা শক্তি বস্তুস্থিত সূক্ষ্ম বা অতিসূক্ষ্ম পরমাণু-স্পন্দনকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ, উভয় স্পন্দন সমজাতীয় ও সমগুণান্বিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ও একীভূত হইয়া যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম-স্নায়ুপ্রসূত যে স্পন্দন, তাহা দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত। এইজন্য, দূর হইতে দর্শন, দূর হইতে শ্রবণ প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহা অলৌকিক বা আজগুবী নয়। এইরূপে, যে পরিমাণে সূক্ষ্ম-স্নায়ুকে জাগ্রত করিতে পারা যাইবে এবং তাহার ভিতর সূক্ষ্ম শক্তি প্রধাবিত করা যাইতে পারিবে, পরিদৃশ্যমান জগৎও সেই পরিমাণে অন্য প্রকার দেখিতে হইবে। ক্রমে, সূক্ষ্মতম স্নায়ুতে যাইলে 'বাহ্যিক' বা 'অভ্যন্তরীণ' বলিয়া কোনো শব্দই থাকে না, সব একীভূত হইয়া যায়। দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও গণিত-শাস্ত্র—এই তিন শাস্ত্রই এক হইয়া যায়, প্রক্রিয়া ও প্রয়োগের তারতম্য থাকে মাত্র।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে এক দিন রাত্রে রাজযোগের এই অংশটি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বলিলেন, "যার যা প্রশ্ন বা মনের কথা আছে, লিখে নিজের ইজেরের পকেটের ভেতর রেখে দিন। আমি সকলের মনের

কথা বলে দিচ্ছি।” সকলে সেইরূপই করিলেন। অনেকের প্রশ্ন তিনি হুবহু বলিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন যে, যাহার যে ইন্দ্রিয় যে পরিমাণে সবল, তাহার শক্তি-বিকাশ প্রথম সেই ইন্দ্রিয় দিয়া হইবে, এবং পরিশেষে অপর সকল ইন্দ্রিয় দিয়া বিকাশ পাইবে। যাহার দৃষ্টিবিষয়ক স্নায়ুপুঞ্জ—Optical nerves সবল, তাহার এই শক্তি বা সূক্ষ্ম-স্নায়ুবিকাশ প্রথম চক্ষু দিয়া হইবে; যাহার কর্ণবিষয়ক স্নায়ুপুঞ্জ—Auricular nerves সতেজ, তাহার সূক্ষ্ম-স্নায়ুপ্রক্রিয়া প্রথম কর্ণেই হইবে; যাহার ঘ্রাণবিষয়ক স্নায়ুপুঞ্জ—Olfactory nerves প্রবল, তাহার সূক্ষ্ম-স্নায়ুপ্রক্রিয়া প্রথম নাসিকা দিয়া হইবে।

পরমহংস মশাই-এর ও স্বামিজীর এইরূপ শক্তিবিকাশ বহু বার দেখিয়াছি। দর্শনশাস্ত্র বা বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রত্যেক ব্যাপারেরই কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকে এবং যত দূর সম্ভব কারণ-নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, তাহার আভাস এই স্থলে দিলাম।

পূর্বস্মৃতি জাগরণে

পরমহংস মশাই পূর্বতন ঘটনাসমূহ, এমন কি, বাল্যকালের সকল ঘটনাও স্পষ্ট বলিয়া যাইতেন, এবং সে সকলই ঠিক হইত। স্বামিজীরও এই শক্তি আমি দেখিয়াছি। ব্রহ্মানন্দের ভিতরেও অনেক পরিমাণে এই শক্তির বিকাশ পাইয়াছিল।

এই স্থানে ‘সংজ্ঞাক্ষেত্র’ সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। সংজ্ঞাক্ষেত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম হইল—‘সাধারণ-সংজ্ঞাক্ষেত্র’, Conscious plane; দ্বিতীয় হইল—‘অধস্তন-সংজ্ঞাক্ষেত্র’, Sub-conscious plane; তৃতীয় বা

উর্ধ্বতম অবস্থা হইল—'অতীন্দ্রিয়-সংজ্ঞাক্ষেত্র', Super-conscious plane.

পরিদৃশ্যমান বাহ্যিক বস্তুসমূহ 'গুণ'-সমষ্টিতে আবৃত। গুণ হইল পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন। কত প্রকার যে গুণ বা স্পন্দন আছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এক এক প্রকার স্পন্দন নির্ণয় করাকে, এক এক প্রকার গুণ আবিষ্কার করা বলে। আমরা সব সময় সকল গুণ বুঝিতে পারি না। দেহের স্নায়ুর স্পন্দন যে প্রকার হইবে, বাহ্যিক বস্তুর স্পন্দনও সেই প্রকার বুঝা যাইবে। কিন্তু, দেহের স্পন্দন যদি বাহ্যিক স্পন্দন হইতে উচ্চমাত্রায় বা অধোমাত্রায় হয়, তাহা হইলে সেই প্রকম্পন দিয়া বাহ্যিক স্পন্দন বুঝিতে পারা যায় না; অপর স্তরের স্নায়ু-প্রকম্পন আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে আমরা বহুবিধ প্রকম্পন উপলব্ধি করিতে পারি। এই হইল নিয়ম যাহাতে আমাদের বাহ্যিক বস্তুর জ্ঞান উপলব্ধি হয়। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে যাইলে, 'বাহ্যিক' ও 'অভ্যন্তরীণ' উভয় জগৎই একীভূত হইয়া যায়। মাত্র স্থূল-স্নায়ুর প্রকম্পনের জন্যই আমরা জগৎকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি।

স্থূল-স্নায়ুর প্রক্রিয়া যদি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তাহা হইলেও সংজ্ঞাক্ষেত্র থাকে; যেমন অজ্ঞান অবস্থায়, বা হঠ-যোগীদিগের ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলেও সংজ্ঞাক্ষেত্র ঠিক থাকে, মৃত হইয়া যায় না। 'মৃত্যু' হইল—যেখানে সংজ্ঞাক্ষেত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রত্যহ বহুবিধ বস্তুর সম্পর্কে আসিয়া থাকি, এবং জীবনের বহু সময় এই সব বস্তু দর্শন করি। এইরূপ এক চিত্রের উপর অপর এক চিত্র অনবরত সংস্থাপিত হওয়ায়, পূর্বতন চিত্র বা জ্ঞান, অধস্তন-সংজ্ঞাক্ষেত্রে চলিয়া যায়। এইজন্য, সাধারণতঃ, আমাদের পূর্ব

ঘটনা বা ঘটনাসমূহের জ্ঞান থাকে না। সাধারণভাবে ইহাকে 'বিস্মৃতি' বলা হয়। সাধারণ-সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থান করিলে বর্তমান অবস্থার সকল কথা বলা যায়, কিন্তু পূর্বতন ঘটনাসমূহের বিস্মরণ হইয়া থাকে বা অস্পষ্টভাবে স্মরণ থাকে। এই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, এক সময়ে বাহ্যিক বস্তুর প্রকম্পনে স্নায়ুর প্রকম্পন সংযুক্ত হওয়ায় যে জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয় না; তাহা অন্তরতর প্রদেশে সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যদি প্রয়াস করিয়া উপযুক্ত উদ্দীপক বা উদ্বোধক ভাব বা কারণ —Fit stimulus বা Suggestive দিয়া সুষুপ্ত স্নায়ুকে বা স্নায়ুপুঞ্জকে সঞ্জীবিত করা যায়, তাহা হইলে পুনরায় সমস্ত ঘটনাবলী পারম্পর্য অনুযায়ী উদ্দীপিত করা যাইতে পারে। বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া দিয়া যদি পূর্বতন মৃতপ্রায় বা সুষুপ্ত স্নায়ুকে বা স্নায়ুপুঞ্জকে পুনরায় জাগ্রত বা জীবিত করা যায়, তাহা হইলে প্রাক্তন সমস্ত বস্তু বা ঘটনা বর্তমানে পরিলক্ষিত হয়। দেশ ও কাল এইরূপ স্থলে বিলুপ্ত হয়, এবং এই কারণে, 'অতীত' বলিয়া কোনো শব্দ থাকে না, মাত্র 'বর্তমান' এই সংজ্ঞা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, পূর্বতন স্নায়ু যদি দূষিত বা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আর পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হয় না। স্নায়ু যে প্রকার প্রকম্পিত হইয়া বাহ্যিক বস্তুর প্রকম্পনকে ধারণ করিয়াছিল বা তাহার সহিত প্রকম্পন সংযোজিত করিয়াছিল, সেই প্রকার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া থাকে; ধারণকালে যদি অস্পষ্ট ভাব থাকে, তাহা হইলে অস্পষ্ট চিত্র উঠিবে। এইরূপে, স্পন্দন যেরূপে সংযুক্ত হইবে, সেইরূপ স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে অতীত চিত্র পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে। 'স্মৃতি' বা Memory ইহাকেই বলা হয়। পূর্ব ঘটনাসমূহকে সঞ্জীবিত করিবার এক উপায়

—পূর্বতন স্নায়ু বা স্নায়ুপুঞ্জ সঞ্জীবিত করা। ইহাকে 'বিপর্যস্ত বা পশ্চাদ্‌মুখী ধ্যান' বলে।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন, "পূর্ব দিনের সমস্ত ঘটনা চিন্তা করো; পূর্ব বৎসর কি ঘটিয়াছিল তাহা চিন্তা করো। তাহার পর, বাল্যকালে কি করিয়াছিলে চিন্তা করো; তাহার পর, ক্রমান্বয়ে পূর্বতন ঘটনাসমূহ চিন্তা করো। তাহা হইলে, ক্রমে ক্রমে পূর্বতন সকল ঘটনা স্মৃতিতে আসিবে।" আর একটি কথা তিনি বলিয়াছিলেন, "গ্রন্থে আছে যে, যদি কেহ পূর্বতন চিন্তা বা পশ্চাদ্‌গামী মনোবৃত্তিকে আরো অধিক দূর লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ভ্রূণ-অবস্থায় সে কিরূপ ছিল তাহাও প্রতীয়মান হইবে; কারণ ভ্রূণ-অবস্থাতেও স্নায়ু আছে ও স্নায়ুর প্রক্রিয়া থাকে। আমি শৈশবকালের অবস্থা অনেক অংশে জাগ্রত করিতে পারি। বুদ্ধদেব জাতক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্বজন্মের অনেক কথা স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন।"

ক-এক বৎসর পূর্বে আগ্রা ও মথুরায় সাবিত্রী নামে এক জাতিস্মর বালিকার কথা শুনা গিয়াছিল। মথুরায় একটি ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হয়। সে স্বামি-পুত্র রাখিয়া মারা যায়। পরে, আগ্রায় তাহার জন্ম হয়; এবং তখন তাহার নাম হয় সাবিত্রী। সাবিত্রীর বয়স যখন আট-নয় বৎসর, তখন সে তাহার নূতন পিতামাতাকে পূর্বজন্মের সকল কথা বলিতে লাগিল। সাবিত্রীর কথা শুনিয়া তাহার পিতা মথুরায় লোক পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, সকলই ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। সাবিত্রী তাহার স্বামী ও পুত্রকে দেখিতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাহার পিতা আরো ক-একটি লোক সঙ্গে লইয়া ট্রেনে করিয়া মথুরায় চলিল। আগ্রার ভাষা হইতে থুমরার ভাষার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ট্রেন-

খানি মথুরা স্টেশনের নিকট আসিলে সাবিত্রী চীৎকার করিয়া মথুরার ভাষায় বলিতে লাগিল, "মথুরা আ গয়ী, মথুরা আ গয়ী।" সাবিত্রী তাহার পর গাড়ি-ভাড়া করিয়া পিতাকে লইয়া যেন পূর্ব পরিচিত রাস্তা দিয়া নিজে মথুরার বাড়িতে আসিল। বাড়িতে ঢুকিয়া বলিল, "এখানে পাতকুয়ো ছিল, কি হল?" স্বামী উত্তর করিল, "পাতকুয়োর মুখে পাথর দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে।" তাহার পর, শয়ন-ঘরে যাইয়া বাক্স দেখাইয়া বলিল, "বাক্সের ভেতর আমার গয়না ছিল, খোলো দেখি।" স্বামী পুনরায় বিবাহ করিয়া সেই সকল অলংকার নূতন স্ত্রীকে দিয়াছিল। তাহার পর সে বলিল, "একটা ঘটির ভেতর করে দেওয়ালের মধ্যে টাকা রেখে গেছি, খোঁড়ো।" দেওয়াল খোঁড়া হইলে টাকা বাহির হইল। তাহার পর, সে তাহার কি অসুখ হইয়াছিল, অসুখের সময় কোন্ ডাক্তার তাহাকে দেখিয়াছিল, কবে সে মারা গিয়াছিল— প্রভৃতি সকলই বলিল। মথুরায় মৃত্যুর সময় ও আগ্রায় জন্মের সময় দুই-ই মিলিয়া যাইল।

সাবিত্রী তাহার পর তাহার মা-ভাইদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইল। নিজেই রাস্তা দেখাইয়া চলিল। সেখানে যাইয়া বাপ, মা, ভাই প্রভৃতি সকলের পায়ে প্রণাম করিল। সাবিত্রী প্রত্যেকের নাম বলিয়া দিতে লাগিল। স্বামী ও শ্বশুরের নাম অপরের কানে বলিল। সাবিত্রীর বাপ-মা কাঁদিতে লাগিল।

মথুরার উকিল-ডাক্তার প্রভৃতি সকলে সভা করিয়া সাবিত্রীকে তাহার পূর্বজন্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সকলই মিলিয়া গেল। অবশেষে, পাছে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া মেয়েটির মৃত্যু হয়, এইজন্য, তাহার নূতন পিতা তাহাকে লইয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেল।

স্নায়ু-বিজ্ঞান অনুযায়ী, স্থূল দেহ নাশ হইলেও সূক্ষ্ম দেহ বা সূক্ষ্ম স্নায়ু সমভাবে থাকে। হিন্দুদিগের যে শ্রাদ্ধক্রিয়া, তাহা হইল এই সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন। কখনো কখনো এই সূক্ষ্ম স্নায়ু বা সূক্ষ্ম শরীর স্থূল দেহ দিয়া বিকাশ পায়। ইহাকে 'জাতিস্মর হওয়া' বলে। যতদূর জানা গিয়াছে, জাতিস্মর হইলে বেশি দিন শরীর থাকে না।

দেখা যায় যে, সাবিত্রীর সাময়িকভাবে পূর্বতন স্নায়ু সঞ্জীবিত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু জাতিস্মর হওয়া যে সম্ভব, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। এই বিষয়ে য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

স্ত্রীভাবে

পরমহংস মশাই যখন স্ত্রীলোকদিগের নিকট বসিতেন, তখন একেবারে স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া যাইতেন। স্ত্রীলোকেরা সেই সময় মনে করিতেন যে, তাঁহারা একজন গিন্নীবান্নী স্ত্রীলোকের কাছে বসিয়া আছেন। অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা মনে করিতেন যে, তাঁহারা একজন প্রবীণা স্ত্রীলোকের কাছে বসিয়া আছেন। এইজন্য, স্ত্রীলোকদিগের দ্বিধা বা সংকোচের ভাব থাকিত না। একজন পুরুষমানুষের কাছে বসিয়া আছেন—এ ভাব তাঁহাদের মনে হইত না।

পরমহংস মশাই সাধনকালে 'সখীভাব' লইয়া বা স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যে স্ত্রীভাবাপন্ন হইতে পারিতেন, এ বিষয় অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে একটি উদাহরণ দিতেছি:

দক্ষিণেশ্বরে এক বার থিয়েটারের অনেকগুলি অভিনেত্রী গিয়াছিল। তাহারা পরমহংস মশাইকে 'সীতা' ও 'সাবিত্রী' অভিনয় করিয়া দেখাইল। পরমহংস মশাই তাহাদিগকে

কীর্তনগায়িকাদের দূতীসংবাদ, ইত্যাদি, অভিনয় করিয়া দেখাইলেন। কীর্তনগায়িকারা অভিনয়কালে কি করিয়া তাহাদের বড় নথটি উঠাইয়া পানের পিচ ফেলে, কি করিয়া হাত নাড়ে, কি করিয়া গলা ও মাথা নাড়ে—তিনি তাহা অবিকল দেখাইতে লাগিলেন। অভিনেত্রীরা ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিল, "ইনি সাধু হয়ে কি করে এত মেয়েলী ঢঙ জানেন!"

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পুরুষমানুষ হইয়া তিনি কি করিয়া এইরূপ অবিকল স্ত্রীভাব বিকাশ করিতে পারিতেন, যাহাতে স্ত্রীলোকদেরও ধাঁধা লাগিত?

ইহা জানা আবশ্যক যে, মানুষের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হইল—পুরুষ-স্নায়ু ও পুরুষ-যন্ত্রাদি; অপরটি হইল—স্ত্রী-স্নায়ু ও স্ত্রী-যন্ত্রাদি। একটি হইল প্রকাশিত, আর একটি হইল সুষুপ্ত। একটি হইল মুখ্য, আর একটি হইল গৌণ। পুরুষের ভিতর পুরুষ-স্নায়ু ও পুরুষ-যন্ত্রাদি বাহ্যিক, এবং অভ্যন্তরে স্ত্রী-স্নায়ু ও স্ত্রী-যন্ত্রাদি বিদ্যমান। স্ত্রীলোকের ভিতরও স্ত্রী-স্নায়ু ও স্ত্রী-যন্ত্রাদি হইল বাহ্যিক, এবং অভ্যন্তরে পুরুষ-স্নায়ু ও পুরুষ-যন্ত্রাদি বিদ্যমান। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কখনো কখনো দেখা যায় যে, পুরুষ-অবয়বাদি উপরে এবং স্ত্রী-অবয়বাদি অভ্যন্তরে। আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে, প্রকাশ্যে স্ত্রী-অবয়ব উপরে রহিয়াছে বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে পুরুষ-স্নায়ু প্রবল।

দেখা গিয়াছে, গর্ভ-অবস্থায় বা ভ্রূণ-অবস্থায় দুইটি যমজ শিশু একত্র সংযুক্ত হওয়ায় পুরুষ-অবয়ব বা স্ত্রী-অবয়ব উপরে বা ভিতরে বিদ্যমান থাকে। কখনো কখনো এরূপও দেখা গিয়াছে যে, একই পুরুষের দেহে সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী চিহ্ন—দাড়ি, স্তন প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি বলিয়াছে যে, সে পুরুষমানুষ। যাঁহারা

এই বিষয়ে গবেষণা করেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে জানেন। এইরূপও দেখা গিয়াছে যে, সতরো-আঠারো বৎসর বয়স্ক যুবা পুরুষের স্তন অল্পপরিমাণে স্ফীত হইয়া তাহা হইতে দুগ্ধ নির্গত হইতেছে। এই যুবকের এইরূপ অবস্থা প্রায় এক বৎসর বা দেড়-বৎসর কাল ছিল; তাহার পর, আবার সাধারণ অবস্থা ফিরিয়া আসিল।

এইরূপ নানা উদাহরণ দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একই দেহের ভিতর পুরুষ-স্নায়ু ও স্ত্রী-স্নায়ু বা পুরুষ-যন্ত্রাদি ও স্ত্রী-যন্ত্রাদি থাকেই; কেবল, একটি মুখ্য ও অপরটি গৌণ। এই সকল হইল জীববিদ্যার আলোচনার বিষয়। এইজন্য, এ স্থলে ইহার বিষয় আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

সাধারণ লোক অতি অল্পসংখ্যক স্নায়ুমাত্র জাগ্রত করিতে পারে, এবং সেইগুলি দিয়া দৈনন্দিন নিয়মিত কার্য করিয়া থাকে। অপর যে বহুসংখ্যক স্নায়ু সুষুপ্ত আছে, সে বিষয় তাহাদের কোনো সংজ্ঞা নাই। কিন্তু, দেখা যায় যে, পরমহংস মশাই বর্তমান যুগে সকল লোক অপেক্ষা অতি সুষুপ্ত স্নায়ুসমূহ জাগ্রত করিয়াছিলেন, এবং বহু প্রকার স্নায়ুপ্রক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন। সাধারণ লোক বা অভিনেতারা যদিও স্ত্রীভাব দেখাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা আনুমানিক অনুকরণ মাত্র। পুরুষ-স্নায়ু দিয়া স্ত্রীভাব বিকাশ করা যায় না। পরমহংস মশাই পুরুষ-স্নায়ু ও স্ত্রী-স্নায়ু সমভাবে জাগ্রত করিতে পারিতেন। তিনি উভয়বিধ স্নায়ু দিয়াই ভাব বা শক্তি বিকাশ করিতেন:

"একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি;
বিপরীত রতি * * *।"

বহুবিধ চিন্তা ও অতি কঠোর তপস্যা করিয়া পরমহংস মশাই পুরুষ-দেহে সমস্ত সুষুপ্ত স্ত্রী-স্নায়ু জাগ্রত করিয়াছিলেন। সাধারণ

লোকের ভিতর এইরূপ দেখা যায় না। কেবল, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বিষয় উল্লেখ আছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে স্ত্রীভাব জাগ্রত করিতে পারিতেন। তিনি যখন শ্রীরাধার ভাব বিকাশ করিতেন, তখন অবিকল শ্রীরাধার মতো হইয়া যাইতেন—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার মতো হইয়া যাইতেন। পুরুষ-স্নায়ু ও স্ত্রী-স্নায়ু সমভাবে জাগ্রত করিয়া উভয় শ্রেণীর স্নায়ু হইতেই ভাব ও শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেন বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে লোকে বলিত, 'বহীরাধা, অন্তঃকৃষ্ণঃ'।

পরমহংস মশাই-এর এইরূপ স্নায়ু-পরিবর্তন সকলেই দেখিয়াছেন। যেরূপ শ্রেণীর লোক তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতেন, অতি অল্প কাল মধ্যেই তিনি সেইরূপ হইয়া যাইতে পারিতেন। তিনি তাঁহার সমস্ত স্নায়ুপুঞ্জ নূতন প্রকারে সামঞ্জস্য করিয়া উপস্থিত ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা কহিতেন। এইজন্য, তিনি স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোক, বালকের সহিত বালক, যুবকের সহিত যুবক, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত, ভক্তের সহিত ভক্ত, জ্ঞানীর সহিত জ্ঞানী, এবং রসিকের সহিত রসিক হইতে পারিতেন। এই সকল হইল তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। A great man is one who can transform himself into various forms according to circumstances—যিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ।

যীশুর সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনিও এইরূপ স্নায়ু-পরিবর্তন করিয়া বালকের কাছে বালকের মতো হইতেন, স্ত্রী-ভক্তদের কাছে স্ত্রীলোকের মতো হইতেন, এবং অন্যান্য লোকদিগের কাছে অন্যান্য রূপ হইতেন।

বাইবেল-এ এই ভাবটিকে Transfiguration বা আকার-পরিবর্তন বলা হইয়াছে। এমন কি, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যীশুর বিষয় চিন্তা করিয়া সমাধিস্থ হওয়ায় সেন্ট ফ্রান্‌সিস অভ্‌ অ্যাসিসি-র দেহে, যীশুর হাত দুইটিতে যে পেরেক মারা হইয়াছিল এবং পাঁজরায় যে বর্শার আঘাত করা হইয়াছিল, সেই সকল ক্ষতচিহ্ন বিকাশ পাইয়াছিল। এ সব বিষয় অনেক কিছু বলা যাইতে পারে। বিষয়টি অতি জটিল।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে এক দিন বলিয়াছিলেন যে, আচার্য শঙ্কর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী লইয়া এক স্থানে যাইতেছিলেন। সম্মুখে একটি পাহাড়। পাহাড়টি ঘুরিয়া যাইলে বিলম্ব হইবে। শঙ্কর শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাহাড় ঘুরিয়া যাইবে, না পাহাড় ভেদ করিয়া যাইবে?" শিষ্যেরা এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। তাহারা পাহাড় ঘুরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শঙ্কর তাহাদের সেইরূপ অনুমতি দিলেন; কিন্তু তিনি নিজে ঐ পথ দিয়া যাইলেন না। শিষ্যেরা বহুক্ষণ পরে গন্তব্যস্থানে আসিয়া দেখেন যে, আচার্য শঙ্কর অনেক পূর্বেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এই উপাখ্যানটি তুলিয়া স্বামিজী বুঝাইতে লাগিলেন, "মন বা চিৎ-শক্তি যখন উচ্চ স্তরে যায়, তখন শরীরের পরমাণুসমূহ—জড় বা ভৌতিক বিন্দুসকল তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায়, জড় পরমাণুসকল চিৎ-শক্তিকে পরিচালিত ও সংযমিত করিতেছে; কিন্তু, চিৎ-শক্তি যখন জড়-শক্তির প্রভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ তেজঃপূর্ণ ভাবে উপনীত হইয়া বহু উচ্চ অবস্থায় উঠে, তখন জড় পরমাণুসকল তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে।

এইজন্য, শঙ্কর জড় পরমাণুসমূহকে বিশ্লেষ করিয়া চিৎ-শক্তি ও কারণ-শরীর লইয়া গন্তব্যস্থানে যাইলেন, এবং পরে, জড় পরমাণুসকলকে পুনরায় সংগঠন করিয়া দেহ ধারণ করিলেন। শঙ্কর বা তাঁহার মতো উচ্চ অবস্থাপন্ন অন্যান্য মহাপুরুষেরা নিজেদের দেহ এইরূপ ইচ্ছামতো পরিবর্তন করিতে পারেন।"

যীশুর উপাখ্যান তুলিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "যীশুর মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ক-এক বার দর্শন করিয়াছিলেন। এমন কি, স্পষ্টভাবে তাঁহার হাত-পা ইত্যাদি স্পর্শ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, যীশুর স্থূল শরীরের যে জড় পরমাণুসমূহ, তাহাই কেবল বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু, তাঁহার কারণ-শরীর ও চিৎ-শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এইজন্য, যীশু মৃত্যুর পরও ক-এক বার পরমাণুসমষ্টি সংযোজিত করিয়া সূক্ষ্ম দেহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার দেহে যে পেরেক ও বর্শার চিহ্ন ছিল, তাহাও তখন স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছিল।" যীশু যে নিজের দেহ পরিবর্তন করিয়া অপর এক জ্যোতির্ময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দেহ হইতে যে এক সময় মহাজ্যোতি বিনিঃসৃত হইয়াছিল—এ বিষয়ে স্বামিজী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে বেশ বুঝাইয়াছিলেন।

লণ্ডনে বক্তৃতাকালে স্বামিজীর যে সব ফোটো লওয়া হইত, সেই সকল ফোটো নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, একই চেয়ারে বসিয়া ও একই পোশাক পরিয়া ছয়-সাত রকমের চেহারা তোলা হইয়াছে। স্বামিজী যেমন মনের ভাব পরিবর্তন করিয়াছেন, ফোটোতেও সেইরূপ

চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে। স্টার্ডি[1] সেই ফোটোগুলি আনিলে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম।

স্বামিজীকে কিন্তু কখনো স্ত্রীভাবাপন্ন হইতে দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। স্বামিজী রুদ্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন। রুদ্রের ভাব বা ক্ষাত্রশক্তি তাঁহার মধ্যে প্রবল ছিল। এইজন্য, তাঁহার মধ্যে মৃদুভাবের তত স্ফুরণ পাইত না। বুদ্ধদেবের ভিতরও স্ত্রীভাবের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কারণ, বুদ্ধদেবও রুদ্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতর রুদ্রের ভাব ছিল।

এ ক্ষেত্রে জানা আবশ্যক যে, মনকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে: ক্রিয়াশীল মন ও নিশ্চেষ্ট মন —Active mind ও Passive mind. একটির বৃত্তি হইল নিজের ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলা, অপরটির বৃত্তি হইল পরের অনুকরণ করিয়া চলা। এই-জন্য, ইহা বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক যে, পরমহংস মশাই যদিও স্নায়ুপুঞ্জ পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন অবয়বসমূহের বহু প্রকার ভাব দেখাইতেন, কিন্তু তিনি কখনো নিজের ব্যক্তিত্ব লোপ করিতেন না। এইটি হইল তাঁহার বিশেষত্ব। অধিকাংশ সময় সাধারণ লোক ভাবপরিবর্তন করিতে গিয়া, নিজ ভাব হারাইয়া ফেলে; এবং অপরের ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, শেষে, অপরের ভাবপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। সকল মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, তাঁহারা পূর্বতন মহাপুরুষদিগকে খুব সম্মান করিয়া চলিতেছেন, খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ হইয়া তাঁহাদের বিষয় কথা কহিতেছেন, কিন্তু নিজ ব্যক্তিত্ব কখনো ক্ষুণ্ণ বা লোপ করিতেছেন না। মহা-

১ শ্রীযুত ই. টি. স্টার্ডি, স্বামী বিবেকানন্দের য়ুরোপীয় শিষ্য

পুরুষদিগের মনোবৃত্তি সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি হইতে এইরূপ অন্য প্রকার হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পরমহংস মশাই ও শ্রীচৈতন্যের ভিতর স্ত্রী-ভাবটি বেশ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। এ স্থলে ভালমন্দের কোনো বিচার হইতেছে না, মাত্র সুষুপ্ত স্নায়ুকে তাঁহারা যে কিরূপ জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহাই দেখানো উদ্দেশ্য। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত বিশেষরূপে জানা থাকিলে, কিরূপে পরমহংস মশাই-এর ইচ্ছামতো দেহ ও স্নায়ু পরিবর্তিত হইত, এবং কিরূপেই বা তাঁহার ভাব ও চিন্তাধারা উঠিত, তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। পরমহংস মশাই অপরের অনুকরণ করিয়া কতকগুলি ভাব জগৎকে দেন নাই; তিনি অনেক প্রকার নূতন ভাব উদ্ভূত করিয়া জগৎকে দিয়াছেন।

পূর্বতন স্নায়ু-জাগরণে

কথিত আছে যে, সাধনকালে, পরমহংস মশাই কাপড়ের ল্যাজ করিয়া বাঁদরের মতো গাছের ডালে বসিয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন; আবার, সাধনকালে, তিনি অপবিত্র দ্রব্যাদি স্পর্শ করিয়াছিলেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের সন্তান; প্রথম জীবনে তিনি পূজরীর কাজও করিতেন। এইরূপ অবস্থার মধ্যে পরিবর্ধিত হইয়া কি করিয়াই বা তিনি অপবিত্র বা অশুচি দ্রব্যাদি—বিষ্ঠা, মৃত গোবৎস প্রভৃতি স্পর্শ করিয়াছিলেন?

কোনো কোনো ব্যক্তির মতে ইহা হইল পিশাচভাব সাধনার লক্ষণ।—এইরূপ উক্তি ভক্তির কথা হইতে পারে, কিন্তু, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণের নিকট ইহার তত সার্থকতা নাই। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক বস্তুরই কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন এবং যথাসম্ভব তাহার

কারণ-নির্ণয় করেন। এইজন্য, অনেক সময় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের মতের সহিত ভক্তির মতের পার্থক্য হইয়া থাকে।

এখন আর একটি কথা এই হইতে পারে যে, পরমহংস মশাই সাধনকালে উন্মাদ হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য এইরূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক মতে, উন্মাদ অবস্থা হইল স্নায়ুর এক প্রকার বিকৃত ভাব। সাধারণ অবস্থায় যে সকল স্নায়ুর প্রক্রিয়া হইতেছে, অর্থাৎ, যে সকল স্নায়ু দিয়া সাধারণতঃ শক্তি প্রধাবিত হয়, সেই সকল স্নায়ু দিয়া বিপর্যস্ত অবস্থায় শক্তি প্রধাবিত হয় না; তখন অন্য প্রকার স্নায়ু দিয়া শক্তি প্রধাবিত হয় এবং প্রধাবন-ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে ও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। এইজন্য, এই অবস্থায় চিন্তাশক্তি ও তর্ক-বিতর্ক দিয়া কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বা মীমাংসায় আসিতে পারা যায় না। ইহাই হইল উন্মাদ বা বায়ুগ্রস্ত অবস্থার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কিন্তু, দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপ অবস্থায় পরমহংস মশাই-এর চিন্তাশক্তি একটি নির্ধারিত উদ্দেশ্য বা স্থানে উপনীত হইতেছে। বিশেষ স্থানে বা এক কেন্দ্রে তাঁহার চিন্তাশক্তি পরিসমাপ্ত হওয়ায়, ইহাকে উন্মাদ অবস্থা বলা যাইতে পারে না। ইহা যদি উন্মাদ অবস্থা না হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত বা বিপরীত ভাব কি করিয়া আসিল—এরূপ তো মানুষের ভিতর সাধারণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না?—ইহাই হইল এখন আলোচ্য বিষয়।

দার্শনিক মত হইল যে, বিভিন্ন স্নায়ুপুঞ্জ যে প্রকার জাগ্রত হইবে, চিন্তাধারাও ঠিক সেই প্রকার হইবে। মনো-বিজ্ঞানেও 'ভাল' বা 'মন্দ' বলিয়া কোনো শব্দ নাই। ইহা হইল নীতিশাস্ত্রের কথা। নীতিশাস্ত্রে ভাল বা মন্দের বিচার

হইতে পারে; মনোবিজ্ঞানে ভাল বা মন্দ বলিয়া কোনো শব্দ হয় না।

বৌদ্ধ গ্রন্থ জাতকে আছে যে, বুদ্ধদেব পূর্ব পূর্ব জন্মে পশুদেহ ও অন্যান্য নানা প্রকার দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং সেই কালে তাঁহার সেইরূপ প্রক্রিয়া বা ভাব বিকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু, জাতক-গ্রন্থে কেবল গল্প বা উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে; এইরূপ ভাব-বিকাশের কোনো কারণ-নির্ণয় করা হয় নাই।

জীববিজ্ঞানে দেখা যায় যে, বহুকালব্যাপী শক্তিপ্রয়োগে, স্নায়ু পরিবর্তিত হইয়া, অতি সামান্যমাত্র প্রাণী হইতে মানুষের দেহ আসিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জলবায়ুর যেমন পরিবর্তন হইবে, স্নায়ুপুঞ্জও তেমন নিজের অভ্যন্তরস্থিত শক্তি বিকাশ করিয়া নিজ অবয়ব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবে। ইহাই হইল সমতা-সাধন-বিধি বা Law of Concordance-এর ধারা। সামান্য প্রোটোপ্লাজ্‌ম হইতে ভ্রূণ ও অর্ভক কি করিয়া আসিল, তাহা চিন্তা করিলে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়—স্নায়ুর বহুকালব্যাপী ক্রমপরিবর্তন ও ক্রমপরিবর্ধন যে হইয়াছে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। একটি ডিম তরল অবস্থা হইতে কি করিয়া স্নায়ুসংযুক্ত হইয়া পক্ষীর রূপ ধারণ করে, তাহা গবেষণা করিলে স্নায়ুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ক্রিয়া বুঝা যায়। ডারুউইন অস্থি-নির্দেশ করিয়া জীবের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। আমি স্নায়ুর উদ্ভব, পরিণতি ও বিকাশ অনুযায়ী জীবের উৎপত্তি নির্ণয় করিতেছি।

জীববিজ্ঞান কিন্তু কেবল ক্রমবিকাশের কথা বলিয়া থাকে; বিপর্যস্ত ভাবের বা বিপরীত গতির—ক্রমবিবর্তনের, কোনো উল্লেখ করে না। রাজযোগ ও হঠযোগের মত হইল

যে, শক্তি বিপরীত দিকে সঞ্চালিত করিলে বহু পূর্বকালের স্নায়ু, যাহা বর্তমানে সুষুপ্ত বা মৃতকল্প হইয়া আছে, সঞ্জীবিত করা যাইতে পারে। জীববিজ্ঞানের সহিত রাজযোগ এবং হঠযোগের এ স্থলে পার্থক্য রহিয়াছে।

দেখা গিয়াছে যে, অনেক রাজযোগী ও হঠযোগী স্নায়ু পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন প্রকার কার্য করিতে পারেন, যেমন অগ্নির উপর দিয়া পদচারণ করা, মাটির ভিতর অবস্থান করা, প্রভৃতি বহু প্রকার অসাধারণ কার্য তাঁহারা করিতে পারেন।

আমি এক ব্যক্তিকে আসবপানে বিহ্বল হইয়া বিশ ঘণ্টা কাল কুকুরের মতো ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, কুকুরের যেরূপ প্রক্রিয়া হয়—চোখের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর, মূত্রত্যাগ, সমস্তই তাহার সেইরূপ হইতে লাগিল। আসব-সংযোগে বা বাহ্যিক শক্তিপ্রয়োগে তাহার বহু পূর্বের কুকুর-স্নায়ুসকল সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য, তাহার সমস্ত মানবভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং কুকুরের সকল ভাব সে পাইয়াছিল।

এক ব্যক্তি সার্কাসে বাঘ লইয়া খেলা করিতেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি এমন ভালমানুষ, কিন্তু কি করে বাঘের সঙ্গে খেলা করতেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "খেলা হওয়ার আগে নির্জন স্থানে অনবরত চিন্তা করতুম—আমি বাঘ, বাঘই আমি। খানিকক্ষণ এই রকম করবার পর, স্নায়ু যখন দৃঢ় হত, তখন ফের চিন্তা করতুম—আমি বড় বাঘ, ও ছোট বাঘ। তার পর, একটা, উন্মত্ত ভাব আসতো; আমি পিঁজরায় গিয়ে একটা, দুটো বা তিনটে বাঘের সঙ্গে খেলা করতুম। আমি যে মানুষ, সে

ভাবটা আমার মনে থাকতো না। কেবল, আমি যে একটা বড়, ভীষণ বাঘ—এই ভাবটা জেগে উঠতো।” আমি তাঁহাকে বলিলাম, “ভাবুন দেখি, আপনার শরীরের কোন্ স্নায়ু দিয়ে, কি রকম ভাবে শক্তি চলছে—আবার আগেকার ভাব আনবার চেষ্টা করুন।” এইরূপ খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর দেখিলাম যে, তাঁহার শান্ত অমায়িক ভাব চলিয়া গিয়া, অভ্যন্তরস্থিত ব্যাঘ্রভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। চোখের দৃষ্টি অন্য প্রকার হইয়া যাইল, ঘাড় বাঁকিয়া গেল, মুখের চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল, গলায় ঘড়ঘড়ে আওয়াজ আসিল। এত পরিবর্তন হইল যে, আমার ভয় হইতে লাগিল পাছে সেই অবস্থায় তিনি আমাকে কামড়াইয়া দেন! আমি সরিয়া যাইলাম। এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম! তিনি নিজের দেহের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মেঝের উপর অনেকক্ষণ শুইয়া রহিলেন। তাহার পর, শান্ত মানুষের ভাব ফিরিয়া আসিলে চলিয়া যাইলেন। যাইবার সময় বলিলেন, “আজ মাথাটা বিগড়ে গেছে, কোনো কাজ করতে পারবো না।” তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বাঘের সহিত খেলা করিয়া তিনি অনেকক্ষণ ফাঁকা জায়গায় পড়িয়া থাকিতেন, কারণ তখন তিনি ব্যাঘ্রভাবে ভরপুর থাকিতেন, এবং মানুষকে সহসা আক্রমণ করিবার সম্ভাবনাও তখন থাকিত। তাহার পর, স্নায়ু ঠাণ্ডা হইলে তিনি মানুষের সহিত দেখা করিতেন।

ময়ুরভঞ্জের ‘শেয়াল-মেয়ে বা শেয়াল-রাণী’, ‘ভল্লুকেধরা-মেয়ে’, আফ্রিকার ‘চিম্প্যানজী-মেয়ে’, শিমলা পাহাড়ের ‘বাঘ-মানুষ’—এই সকল হইল আরো নানা উদাহরণ।

ক-এক বৎসর পূর্বে কোনো এক বিশিষ্টা রমণী সংবাদ-পত্রে ময়ুরভঞ্জের শেয়াল-মেয়ে বা শেয়াল-রাণীর কথা

লিখিয়াছিলেন। একটি ইংরেজের মেয়েকে অতি শৈশবে শেয়ালে লইয়া যায়। শেয়ালী মেয়েটিকে দুধ দিয়া পালন করিয়াছিল। মেয়েটি বড় হইলে শেয়ালের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল, কেবল অবয়বাদি মানুষের মতো রহিল। সাঁওতালরা জঙ্গল হইতে গরু চরাইয়া আসিলে বলিত যে, জঙ্গলের ভিতর সাদা পেতনী আছে, মানুষ দেখিলে পলাইয়া যায়। এই কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে লোকজন যাইয়া জঙ্গল ঘিরিয়া শেয়াল তাড়াইয়া মেয়েটিকে ধরিয়া আনিল। মেয়েটির বয়স পনরো-ষোল হইবে। মেয়েটিকে কাপড় পরাইয়া তাহারা একটি ঘরে রাখিল। স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মেয়েটি শেয়ালের মতো রব করিয়া কাঁদিত। ইহা শুনিয়া চারিদিক্ হইতে শেয়াল আসিয়া তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কাঁদিত। মেয়েটিকে দুধ আর ভাত খাইতে দেওয়া হইত, সে মুখ দিয়া তাহা খাইত। দিন কতক পরে মেয়েটি মরিয়া যায়।

আমাদের বাড়ির কাছে মহেন্দ্র গোসাঁই লেনে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ হইতে বালিকাদিগের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দার্জিলিঙ-এর জঙ্গল হইতে একটি মেয়েকে আনিয়া সেখানে রাখা হইয়াছিল। আমি মাঝে মাঝে মেয়েটিকে দেখিতে যাইতাম এবং আশ্রমের অধ্যক্ষ মহেশ আতর্থী মশাইকে মেয়েটির বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। মেয়েটি যখন বালিকাদিগের সঙ্গে খেলা করিত, তখন মানুষের মতো দাঁড়াইয়া থাকিত; কিন্তু যখন একাকী থাকিত, তখন হাঁটু আর হাতের উপর ভর দিয়া চলিত। একটু রাগ হইলে ঘরের কোণে যাইয়া ভল্লুকের মতো গলার আওয়াজ করিত এবং হাতের আঙুল দিয়া আঁচড়াইতে যাইত ও কামড়াইতে যাইত। মেয়েটি একটু বড় হইলে

দেখা গেল যে, সে ভুটিয়াদের মেয়ে। বছর বারো-তেরো বয়স হইলে মেয়েটি মারা যায়।

ক-এক বৎসর পূর্বে একখানি সংবাদপত্রে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আফ্রিকায় যেখানে চিম্প্যানজীর বাসস্থান, সেখান হইতে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা চিড়িয়াখানায় জীবন্ত চিম্প্যানজী ধরিয়া আনিবার জন্য জঙ্গল বেষ্টন করে। অবশেষে, বৈজ্ঞানিকরা দেখিল যে, চিম্প্যানজীদের সঙ্গে একটি শুভ্রকায় মেয়ে রহিয়াছে, বয়স বছর দশ হইবে। মেয়েটি গাছের ডালে বসিয়া থাকে, চিম্প্যানজীদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া থাকে এবং চিম্প্যানজীদের মতো খাইয়া থাকে। আমেরিকানরা যখন চিম্প্যানজী ধরিবার চেষ্টা করিল, তখন চিম্প্যানজীরা গাছের ডাল ভাঙিয়া লাঠি করিয়া মারিতে আসিল, মেয়েটিও সেই রকম গাছের ডাল ভাঙিয়া লইয়া মারিতে আসিল। আমেরিকানরা অনেক কষ্টে চিম্প্যানজীদের তাড়াইয়া মেয়েটিকে ধরিল এবং তাহার গায়ে আবরণ দিয়া ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া আসিল। মেয়েটির শরীর চিম্প্যানজীর মতো বলিষ্ঠ ছিল। পরে, বৈজ্ঞানিকদিগের ভিতর কথা উঠিল যে, যদি মেয়েটিকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে চিম্প্যানজীদের ভাষা আর মানুষের ভাষা উভয়ই বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে পরে কি হইয়াছিল, তাহার কোনো সংবাদ জানি না।

শিমলা পাহাড়ে একটি বাঘ-মানুষ ছিল। ইটালীর উপেন দেবের[১] বাড়িতে তাহার ফোটো ছিল। সে হাঁটু ও হাত দিয়া চলিত; কিন্তু ঘোড়া বা গরু দেখিলেই হাঁটু হইতে

১ কলিকাতাস্থ ইটালী নিবাসী জমিদার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোড়া বা গরুর চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া চাটিয়া চাটিয়া রক্তপান করিত। ফোটোতে তাহার চেহারা অনেকটা বাঘের মতন দেখিয়াছিলাম।

এ স্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, মানুষের দেহে পূর্ব-জন্মের বানর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি অবস্থার চিহ্ন বা স্নায়ু আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। জীববিজ্ঞান যে বিষয়ে অনুমানের উপর তর্ক-বিতর্ক করিয়া থাকে, এই সকল উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। চেষ্টা ও অভ্যাস করিলে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পূর্বতন স্নায়ুসমূহকে জাগ্রত করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধমতে বলা হয় যে, চৌষট্টি লক্ষ দেহ পরিবর্তন করিয়া জীব মানুষের দেহে উপনীত হয়। এ বিষয়ে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মানুষের দেহের ভিতর বহু পূর্বজন্মের সুষুপ্ত স্নায়ুসমূহ আছে। অবশ্য, তাহা সাধারণ লোকে সঞ্জীবিত করিতে পারে না। কিন্তু, মানুষের দেহ যে এক কালে কুকুর, ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতির দেহ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সাধনকালে পরমহংস মশাই তাঁহার চিন্তাশক্তি বিপরীত-দিকে সঞ্চালিত করিয়া বহু পূর্বজন্মের বা বহু পূর্বদেহের সুষুপ্ত স্নায়ুপুঞ্জ সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া অতি প্রাচীনতম সুষুপ্ত স্নায়ুপুঞ্জ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। বাহ্যিক, মানুষের মতো দেহ থাকিলেও, অভ্যন্তরীণ স্নায়ুর পরিবর্তন হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য তাঁহার দেহ ও প্রবৃত্তি ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। পরমহংস মশাই-এর চিন্তাশক্তি যেমন উচ্চ স্তরে উঠিতে পারিত—যাহার নিকটেও অপরের চিন্তাশক্তি যাইতে পারে না, তেমনি তাঁহার চিন্তাশক্তি বিপরীতদিকে গমন করিয়াও

বহু বহু পূর্বকালের স্নায়ুপুঞ্জকে উদ্বোধিত করিতে পারিত। তিনি এক দিকে যেমন সূক্ষ্ম-স্নায়ুপুঞ্জ জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি প্রাচীনতম সুষুপ্ত স্নায়ুপুঞ্জ জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন। এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্যন্ত—বহু প্রকার স্নায়ু তিনি সমভাবে জাগ্রত করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য, নানা বিষয়ে তাঁহার অতীব আশ্চর্য ও অভ্রান্ত ভাব হইয়াছিল। এত উচ্চেও কেহ উঠিতে পারেন নাই, কিংবা এত নিম্নেও কেহ নামিতে পারেন নাই। জগতে এইরূপ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমহংস মশাই-এর সাধনকালের এই সকল প্রক্রিয়া উপহাসের বস্তু নয়, বা ইহা যে ভক্তজনের লীলারহস্য—তাহাও নয়। পরমহংস মশাই-এর জীবনের এই সকল ব্যাপার ও প্রক্রিয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের বিশেষ গবেষণার বিষয়। এই-জন্য, আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, বর্তমান যুগে দর্শন-শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের তিনি মূর্ত প্রতীক।

ভাব ও স্নায়ুর সম্মিলনে

এক একটি ভাবের জন্য এক একটি স্নায়ু। এক একটি স্নায়ু দিয়া এক একটি ভাব বা চিন্তাস্রোত বা শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু, এক একটি স্নায়ু স্পন্দিত হইয়া তাহা হইতে শক্তির বিকাশ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে, একটি মাত্র স্নায়ু দিয়া ভাব বিকাশ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। ইহা মাত্র সমাধি-অবস্থায় হইতে পারে। সাধারণতঃ, একের অধিক সমজাতীয় ও সমগুণান্বিত স্নায়ুর প্রকম্পমান অবস্থায় যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'ভাব' বলা হয়। ভাব হইল—চিন্তা, যাহার কোনো প্রয়োগ হয় নাই; চিন্তার জন্যই চিন্তা। 'বাসনা' হইল—সেই চিন্তা যখন অপর বস্তুতে প্রযুক্ত হয়,

এবং সেই বস্তুটিকে নিজের সন্নিকটে টানিবার চেষ্টা হয়। এইজন্য, ভাব বা Idea এবং বাসনা বা Desire-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। একটি হইল নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয়, আর একটি হইল সাপেক্ষ বা সক্রিয়।

স্বামিজী শেষ জীবনে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কবিরাজ ঔষধের ব্যবস্থা করেন। তিনি স্বামিজীকে একচল্লিশ দিন জল পান করিতে নিষেধ করেন, এবং ইচ্ছামতো দুধ খাইতে বলেন। স্বামিজী এই সময় এক দিন গিরিশবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন। গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বহুমূত্র রুগী, একচল্লিশ দিন জল না খেয়ে কি করে থাকবে?" স্বামিজী বলিলেন, "আমি শরীরকে বারণ করে দিয়েছি, সে একচল্লিশ দিন জল খাবে না।" গিরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "সে আবার কি কথা, 'শরীরকে বারণ করে দিয়েছি'?" স্বামিজী বলিলেন, "এক গ্লাস জল আনো দেখি।" তাহার পর, স্বামিজী সেই গ্লাসের জলের মাপ দেখাইয়া, সমস্ত জল পান করিলেন; গ্লাসে আর কিছুই জল রহিল না। খানিকক্ষণ পর, উদ্‌গার করিয়া পরিষ্কার জল গ্লাসে ঢালিয়া দিলেন; জলের মাপ পর্যন্ত ঠিক হইল, একটুও কম হইল না। গিরিশ-বাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন। স্বামিজী বলিলেন, "এক ফোঁটা জলও আর দেহ নেবে না।" গিরিশবাবু ভক্ত লোক, তিনি এ বিষয়ে অনেক কিছু কথা কহিতে লাগিলেন। স্বামিজী হাসিয়া বলিলেন, "দূর শালা জি. সি.[১], এই সামান্য একটা দেখেই অবাক্ হলি? এ-কে বলে Controlment of nerves—স্নায়ু সংযত করা।"

১ স্বামী বিবেকানন্দ আনন্দিত হইলে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে এই নামে ডাকিতেন।

স্বামিজী লণ্ডনে রাজযোগের বক্তৃতাকালে স্নায়ু-সংযমন বা Controlment of nerves-এর বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "The greatest display of energy is in controlling the energy"—শক্তিকে সংযত করাই শক্তিমত্তার প্রধান লক্ষণ বা চিহ্ন।

বিভিন্ন স্নায়ুর যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কতকগুলি উদাহরণ প্রদত্ত হইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ঃ

বাঁকুড়া জেলায়, পাত্রসায়ের-এ, গিরিবালা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক বহু বৎসর পর্যন্ত কোনো দ্রব্য আহার করেন নাই। তিনি সহজ মানুষের ন্যায় কাজ-কর্ম করিতেন। এইরূপ শুনা গিয়াছে যে, অল্প বয়সে বিধবা হওয়ায়, নিরাশ্রয়া হইয়া, তিনি অত্যন্ত বিমনা ও বিষণ্ণা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ অতিমাত্রায় বিমনা হওয়ায় বা শক্তি প্রয়োগ করায়, তাঁহার স্নায়ু পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি যে স্নায়ু-প্রক্রিয়াসমূহ, সে সকল বিলুপ্ত বা নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণ লোকের যেরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইয়া থাকে, তাঁহার সেরূপ হইত না ; অথচ, তাঁহার শরীরের কোনো হানি হয় নাই। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বিশেষ এক প্রকার স্নায়ু-প্রক্রিয়া হইলে তাহাকে 'ক্ষুধা' বলে।

মহাযুদ্ধের সময় হাঙ্গারির এক ব্যক্তির তোপের গোলায় আঘাত লাগে। হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার পর, যখন সে আরোগ্য হইয়া আসিল, তখন তাহার 'নিদ্রা' বলিয়া কোনো ক্রিয়াই রহিল না। নিদ্রাও নাই, ক্লান্তিও নাই। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, 'নিদ্রা' বলিয়া যে স্নায়ু-প্রক্রিয়া, তাহা বিলুপ্ত হওয়ায়, সেরূপ কোনো প্রক্রিয়াই হইতেছে না।

বুদাপেশ্‌ৎ-এ কোনো এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের শরীরে

বাঁদরের স্নায়ু সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। ফল এই হইল যে, বৃদ্ধ অধ্যাপক অবশেষে ব্যবহারে বাঁদরের ন্যায় হইয়া যাইলেন। তিনি কাপড় পরিতেন না, গাছের ডালে উবু হইয়া বসিয়া থাকিতেন; মুখের সাহায্যে খাইতেন; এবং কাঁচা গাজর ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় খাদ্য হইল। তিনি বাঁদরের মতো মুখ ভেংচাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। মানুষের ন্যায় কথাবার্তা কহা তিনি প্রায় ভুলিয়া যাইলেন। এইরূপে স্নায়ু-পরিবর্তন হওয়ায় তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।

জীবচ্ছেদ বা Vivisection প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, আঙুলের বিশেষ এক একটি সূক্ষ্মস্নায়ু তুলিয়া লইলে, শীতলতা, উষ্ণতা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বোধ বা Sensation থাকে না। আঙুল পুড়িয়া যাইলেও, আঙুলে অগ্নির উত্তাপ বোধ হয় না। এইরূপ বহু প্রকার স্নায়ু-প্রক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এক একটি স্নায়ু বা স্নায়ুপুঞ্জ এক একটি ভাবপ্রবাহের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'ভাব' হইতে 'স্নায়ু' উৎপন্ন হইয়াছে, না 'স্নায়ু' হইতে 'ভাব' উৎপন্ন হইয়াছে? কোন্ বস্তুটি কাহার কারণ বা কাহার কার্য?

এক মত হইল ঃ

> "বাসনায় মনের জনম,
> মন সৃষ্টি করে এ শরীর।
> অনন্ত বাসনা উঠে তায়,
> ভাসে মন বাসনা-সাগরে।" *

* "চৈতন্যলীলা", গিরিশচন্দ্র।

বৈজ্ঞানিক মত হইল যে, পরমাণুসমূহের বহুবিধ স্পন্দন হয়, এবং এই স্পন্দনসমূহ হইতেই পরমাণুসকল একসূত্রে পারম্পর্যরূপে সন্নিবেশিত হওয়ায় অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ুসমূহ সৃষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম-স্নায়ুসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য পর পর অপর স্থূল-স্নায়ুসমূহ নির্মিত হয়; কারণ, বাহ্যিক শক্তি সূক্ষ্ম-স্নায়ুসমূহকে অচিরে বিনাশ করিতে পারে। ভ্রূণ ও ডিম হইতে কি করিয়া জীব সৃষ্ট হয়, তাহা পর্যবেক্ষণ করিলেই এ বিষয়ে বেশ বুঝা যাইতে পারে। এইজন্য, বাহ্যিক শক্তির সহিত দ্বন্দ্ব করিবার উদ্দেশ্যে এবং সূক্ষ্ম-স্নায়ুপুঞ্জকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, স্থূল-স্নায়ুসমূহ বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পরে নির্মিত হয়। সাধারণ ক্রিয়াসকল এই স্থূল-স্নায়ুসমূহ দিয়া হইয়া থাকে। আর, এইজন্যই সাধারণ ভাষায় আমরা 'স্থূল-বুদ্ধির লোক', 'সূক্ষ্ম-বুদ্ধির লোক' প্রভৃতি বলিয়া থাকি।

পশু ও উদ্ভিদ প্রভৃতির ভিতরেও স্নায়ু-প্রক্রিয়া বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। স্নায়ু-বিজ্ঞান অনুযায়ী চিন্তা করিলে, মানুষ, পশু ও উদ্ভিদ প্রভৃতি সকলই একই শ্রেণীর ভিতর আসিয়া পড়ে, কেবল, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্নায়ুর নানা প্রকার উৎকর্ষ দেখা যায়—এইটুকু যা পার্থক্য। জীববিদ্যায় দেখা যায় যে, মানুষ ও পশুদিগের ভিতর অধিকাংশ স্নায়ুতেই একই প্রকার প্রক্রিয়া হইয়া থাকে; এবং পশুদিগের স্নায়ু-প্রক্রিয়া ও উদ্ভিদ ইত্যাদির Fibre—সূক্ষ্ম-সূত্র বা স্নায়ুর প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক পরিমাণে সামঞ্জস্য আছে। এইজন্য, এই তিন শ্রেণীই এক বিষয়ক বা এক শ্রেণীর অন্তর্গত।

দেহযন্ত্রের বা ইন্দ্রিয়সমূহের বা বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্র সমাবিষ্ট স্নায়ুপুঞ্জের প্রক্রিয়া বা সমষ্টি-শক্তি থাকিলেও, ইহা জানা আবশ্যক যে, প্রত্যেক স্নায়ুতে এবং প্রত্যেক পরমাণুতেও সমস্ত দেহের বা সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর শক্তি তো সুষুপ্তভাবে আছেই,

এমন কি, সমগ্র শক্তি বা পূর্ণ শক্তিও আছে। এ বিষয় একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

কথিত আছে যে, একজন সাধু পিঠ হইতে আলো বাহির করিয়া অন্ধকার রাত্রে পরমহংস মশাইকে কালীমন্দিরে ফিরিয়া আসিবার পথ দেখাইয়াছিলেন।

অনুরূপ আর একটি ঘটনার বিষয়ও শুনিয়াছি। বোম্বাই-এ একটি মারাঠী যুবক ছিল। তাহার একটি শক্তি বা সিদ্ধাই ছিল। দুইটি চোখ তুলা দিয়া ঢাকিয়া কাপড় দিয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেও, কপালের সম্মুখে বই ধরিলে সে তাহা পড়িয়া যাইতে পারিত। উন্মুক্ত চোখে যেমন দ্রুতভাবে পড়িতে পারিত, বদ্ধ অবস্থায় তেমন পারিত না, ধীরে ধীরে পড়িত—এইমাত্র প্রভেদ। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত যে, তাহার কপালের মধ্যে একটি শিরা আছে; তাহার ভিতর হইতে সে আলো বাহির করে এবং সেই আলো বইয়ের উপর পড়িলে, সে দেখিতে পায়। অবশ্য, বইখানি নিকটে রাখিতে হইত, অর্থাৎ, সেই অদৃশ্য-আলোকের পরিধির ভিতর রাখিতে হইত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি করিয়া ইহা সম্ভবপর? এ কথা বুঝিতে হইলে, ইন্দ্রিয় কি, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রক্রিয়াই বা কি, তাহা জানা আবশ্যক। —Organ is an organised system of nerves, অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় হইল—সমজাতীয়, সমগুণান্বিত এবং সংশ্লিষ্ট স্নায়ুপুঞ্জ। এই স্নায়ুপুঞ্জ কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে একত্র সংযোজিত হইলে, এবং তাহার ভিতর দিয়া শক্তি প্রধাবিত হইলে, এক এক প্রকার প্রক্রিয়া হইয়া থাকে; যেমন, চোখের স্নায়ুপুঞ্জ দিয়া এক প্রকার প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, নাসিকার স্নায়ুপুঞ্জ দিয়া এক প্রকার প্রক্রিয়া হইয়া থাকে—এইরূপ স্নায়ুপুঞ্জের বিভিন্ন

প্রকার প্রক্রিয়া দেখা যায়। প্রত্যেক স্নায়ুপুঞ্জের উদ্দেশ্য হইল অভ্যন্তরীণ স্পন্দন উদ্বুদ্ধ করিয়া বহিঃস্থ স্পন্দনকে গ্রহণ করা, অর্থাৎ, বহিঃস্থ স্পন্দন যে পরিমাণে হইতেছে, অভ্যন্তরীণ স্পন্দন সেই পরিমাণে প্রবুদ্ধ করিয়া বা সমভাবে স্পন্দিত করিয়া তাহা গ্রহণ করা। ইহাই হইল বাহ্যিক বস্তুর 'জ্ঞান'। কিন্তু, স্পন্দনের যদি তারতম্য হয়, তাহা হইলে বস্তু সম্বন্ধে 'জ্ঞান' হয় না।

এখন দেখা যাউক, 'দৃষ্টিশক্তি' কি?—স্নায়ুর ভিতর পরমাণুসমূহের স্পন্দন হওয়ায়, তাহা হইতে জ্যোতি উৎপন্ন হয়। সেই জ্যোতি বহিঃস্থ স্পন্দনপ্রসূত জ্যোতির সহিত সমক্ষেত্রে আসিলে, আমরা বাহ্যিক আলো বা জ্যোতি দেখিতে পাই। কিন্তু, স্নায়ু যদি নিষ্ক্রিয় বা মৃত হইয়া যায়, এবং অভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃস্পন্দন উৎপন্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে বাহ্যিক জ্যোতি বা স্পন্দন অনুভব করা যায় না। চোখ বুজাইয়াও আমরা অনেক সময় জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাই, এবং নিদ্রিত অবস্থাতেও জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাই। এই সকল হইল অন্তরস্থিত পরমাণুর স্পন্দনপ্রসূত 'জ্যোতি' বা 'আলোক'। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক মত হইতে এই মত সম্পূর্ণ পৃথক্, সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজযোগ ও হঠযোগে এই মত পোষণ করে।

পরমাণুতে ও স্নায়ুতে সুষুপ্তভাবে শক্তি না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট অবস্থায় সমষ্টি-শক্তি আসিতে পারে না। কেবল সমষ্টির শক্তি সক্রিয়; স্নায়ু ও পরমাণুর শক্তি সুষুপ্ত—এই প্রভেদ। কিন্তু, প্রয়াস বা অভ্যাস করিলে, পরমাণুর ও স্নায়ুর সুষুপ্ত শক্তি জাগ্রত করা যাইতে পারে। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক মতে স্বয়ং-ক্রিয় স্নায়ুর কথা যাহা বলা হয়, তাহা এ স্থলে প্রয়োজ্য হয় না। স্বয়ং-ক্রিয় স্নায়ু বহুকালব্যাপী

অভ্যাস হইতে হইয়াছে, আয়াস না করিলেও উহার প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু, অভ্যাস বা প্রয়াস যদি বিপরীত দিকে করা হয়, তাহা হইলে স্বয়ং-ক্রিয় স্নায়ুর প্রক্রিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্নায়ুসকল এই সমস্ত প্রক্রিয়া পাইল কিরূপে?—আমি কনস্তান্তাইনোপ্‌ল বা পুরানো ইস্তান-বুল-এ গোল্ডন হর্ন্ নামক সমুদ্রের খাঁড়িতে বসিয়া একটি কাঠি দিয়া জেলি-ফিশ (Jelly-fish) বিঁধিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতাম। দেখিতাম যে, জেলি-ফিশ-এর প্রোটোপ্লাজ্‌মের প্রত্যেক অঙ্গ দিয়াই সমস্ত কাজ হইতেছে। ইহাকে In-organic বা অ-ইন্দ্রিয় প্রাণী বলা হয়, এবং ইহার উৎপাদন-ক্রিয়া আপনা হইতেই হইয়া থাকে। জেলি-ফিশ-এর পিঠের এক অংশ ফুলিয়া উঠিয়া, পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া, অপর একটি জেলি-ফিশ হয়। এই অবস্থায় সকল প্রক্রিয়াই প্রোটোপ্লাজ্‌ম দিয়া হইতেছে।

অপর একটি বিষয় হইল—ভ্রূণ বা Fœtus অবস্থার কথা। ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় সমস্ত প্রক্রিয়া সকল স্থান দিয়া হইতেছে; পরে, যখন সংগঠিত অবস্থায়—Organised state-এ আসে, তখন বিশেষ বিশেষ স্নায়ুপুঞ্জ দিয়া বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া হইয়া থাকে।

আর একটি উদাহরণ হইল, Invertebrate—মেরুদণ্ড-বিহীন জীব বা অ-মেরুদণ্ডী। যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড হয় নাই, সেই সকল প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি বা দৃষ্টি-প্রক্রিয়া সকল স্থান দিয়াই হইয়া থাকে। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতির এইরূপ হইয়া থাকে। Vertebrate—মেরুদণ্ডযুক্ত জীব বা মেরুদণ্ডী হইলে প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রকার হইয়া যায়।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সকল স্নায়ুতেই সকল

প্রকার শক্তি ও প্রক্রিয়া সুষুপ্তভাবে আছে, কেবল, সংগঠিত অবস্থায় বিশিষ্ট স্নায়ু দিয়া শক্তি সক্রিয় হয়। এইজন্য, বিশেষ বিশেষ স্নায়ুপুঞ্জ বা ইন্দ্রিয় দিয়া বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া হইয়া থাকে।

এখন কথা হইল যে, সাধুটির পৃষ্ঠদেশ হইতে আলো বা জ্যোতি নির্গত করা সম্ভবপর কিনা?—এ স্থলে জানা আবশ্যক যে, ভ্রূণ-অবস্থা হইতে পরিবর্ধিত হইয়া দৃষ্টি-স্নায়ু-সকল সর্বশেষে মস্তিষ্কে পরিসমাপ্ত হয়। এইজন্য, দৃষ্টি-স্নায়ু-সকল বা দৃষ্টির ইন্দ্রিয় এত সূক্ষ্ম। মেরুদণ্ডের এক এক স্থানে বিভিন্ন স্নায়ুপুঞ্জের এক একটি কেন্দ্র আছে; এবং সেই স্নায়ুকেন্দ্রসকল মস্তিষ্কের নানা স্থানে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য, মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রসকল প্রবুদ্ধ ও সক্রিয়, এবং মেরুদণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্রসকল সুষুপ্ত। কিন্তু, চেষ্টা করিলে বা বিপরীত দিকে শক্তি সঞ্চালিত করিলে মেরুদণ্ডের স্নায়ু-কেন্দ্রসমূহকে প্রবুদ্ধ করা যাইতে পারে। ইহা সাধারণ ব্যাপার নয়, কিন্তু সম্ভবপর। আমি এই সাধুর ব্যাপারটি দেখি নাই, কিন্তু, বোম্বাই-এর মারাঠী বালকটির কথা বিশেষ-রূপে জানি। জীবতত্ত্ব বা স্নায়ুবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী ইহা যে সম্ভবপর, তাহা বলা যাইতে পারে।

দেখা যাইত যে, পরমহংস মশাই-এর যেমন ভাব হইত, স্নায়ুও সেইরূপ পরিবর্তিত হইয়া যাইত। তিনি যেমন মুখে বলিলেন যে, টাকা বা কাঞ্চন ছুঁইবেন না, তেমনই তাঁহার হাত ইত্যাদি বা স্নায়ুপুঞ্জ আর টাকা বা কাঞ্চন ছুঁইতে পারিল না। এমন কি, যে স্নায়ু বা যে ভাবকে তিনি বন্ধ বা নিষ্ক্রিয় হইতে আদেশ করিতেন, সেই স্নায়ুর ক্রিয়া আর হইত না বা সেই ভাব আর আসিত না। এইরূপ, বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয় যাঁহারা লক্ষ্য

করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সাধারণ লোকের এইরূপ হইতে পারে না। এইরূপ স্নায়ু-সংযমন ও স্নায়ুর একত্র সম্যক্ মিলন জগতে এক অতীব আশ্চর্য ব্যাপার।

মাঝীর প্রহারে

কথিত আছে যে, এক দিন গঙ্গার উপর নৌকাতে একজন মাঝী আর একজন মাঝীকে প্রহার করিতেছিল। পরমহংস মশাই নিবিষ্টমনে তাহাদের ঝগড়া দেখিতেছিলেন। অবশ্য, এ কথা বলা বাহুল্য যে, তিনি যখন যাহা দেখিতেন, তাহা একাগ্র ও তন্ময় হইয়া দেখিতেন। আঘাতের ফলে প্রহৃত মাঝীর গায়ে দাগ উঠিল। ইহাতে তখনই পরমহংস মশাই-এর গায়েও ঠিক ঐ একই স্থানে আঘাতের দাগ দেখা যাইল। হৃদু মুখুজ্যে পরমহংস মশাই-এর গায়ের এই দাগ দেখিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন, এবং যে প্রহার করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়ার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরমহংস মশাই বলিলেন, "দেখছো না, একটা মাঝী আর একটা মাঝীকে মারলে! তাতেই আমার গায়ে দাগ উঠল!"

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ইহা অলীক, না কাল্পনিক; না, ইহার কোনো প্রকৃত অর্থ বা কারণ আছে?—আমি একটি যুবকের নিকট অনুরূপ একটি ঘটনার বিষয় শুনিয়াছিলাম।

স্বামিজী পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দার্জিলিঙ-এ গমন করেন। সেখানে এক দিন সকালে চা পান করিয়া দুইটি বালককে সঙ্গে লইয়া তিনি বেড়াইতে যান। স্বামিজীর শরীর তখন মোটামুটি সুস্থই ছিল। স্বামিজী যখন রাস্তায় বেড়াইতে যাইতেন, তখন নিতান্ত একমনা ও

তন্ময় হইয়া চলিতেন।—চিন্তাশীল লোকদিগের নিয়মই হইল যে, যখন তাঁহারা পায়চারি করেন, বা কোনো নির্জন স্থানে যান, বা কোনো সুরম্য দৃশ্য দেখেন, তখন তাঁহারা একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিলেই তাঁহাদের মন সাধারণতঃ উচ্চ অবস্থায় উঠিয়া যায়। ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই স্বাভাবিক ভাব, তাহা না হইলে তিনি চিন্তাশীল হইতে পারেন না।

যাহা হউক, স্বামিজী অগ্রে যাইতেছিলেন, যুবক দুইটি পশ্চাতে ছিল। স্বামিজী সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বড্ড ব্যথা লেগেছে, কষ্ট হচ্ছে!" যুবক দুইটি জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামিজী, কোথায়? কি করে ব্যথা লাগলো?" স্বামিজী কাতরভাবে ও করুণস্বরে বলিলেন, "দেখলি নি, পাহাড়ের গায়ে লেগে ঐ মুটে স্ত্রীলোকটা গুমিয়ে পড়েছে! ওর কোমরটায় কী ধাক্কা লাগলো!" এই বলিয়া স্বামিজী কোমরে হাত দিয়া বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। আর বেড়াইলেন না, বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, সত্যই কত লাগিয়াছে।

যুবক দুইটির বয়স অল্প ছিল, তাহারা মনে করিল— এ আবার কি ঢঙ! এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর এক গাঁয়ে মাথা ব্যথা! কোথায় মুটে স্ত্রীলোকটার কোমরে চোট লাগলো, আর স্বামিজীর কোমরে ব্যথা হল! জগতে কত ঢঙই যে আছে তা বলা যায় না! তাহারা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

যমজ ভাইদের ভিতরও দেখা গিয়াছে যে, দুই ভাইকে দুই বিভিন্ন স্থানে রাখা হইয়াছে; কিন্তু, একজনের শরীরে আঘাত লাগিয়া জ্বর হইলে, অপর ভাইটির শরীরে অনুরূপ স্থলও সহসা ফুলিয়া উঠিয়া জ্বর হইয়াছে, অথচ, অনেক দিন

যাবৎ পরস্পরে কেহ কাহাকেও দেখে নাই বা আঘাত লাগার সংবাদও জানে না।

এই সকল ব্যাপার কি করিয়া হয়, ইহাই হইল প্রশ্ন। —মন যখন স্থূল-স্নায়ুতে বা স্থূল-শরীরে থাকে, তখন তাহার বিকাশও অতি স্থূলভাবে হইয়া থাকে। স্থূল-শক্তির গতি অল্প সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে বা অল্পপরিধিযুক্ত হয়। এইজন্য, স্থূল অবস্থায় বিশ্লিষ্ট ভাব—'খণ্ড' বা 'দ্বন্দ্ব' অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইল দুঃখ ও অশান্তির কারণ। শান্তি হইল, 'শান্ত' বা 'সাম্য' অবস্থায় উপনীত হওয়া। চিৎ-শক্তি যখন সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়, তখন খণ্ড বা বিশ্লিষ্ট ভাব চলিয়া যাইয়া সাম্য, একীভূত বা অখণ্ড অবস্থা বিকাশ পায়—জগৎ বা সৃষ্টি যে সর্বত্র এক শক্তি বা এক উপাদান বা এক মূল কারণে পরিব্যাপ্ত, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; মাঝখানে কোনো ব্যবধান বা বিচ্ছেদ বলিয়া কিছু থাকে না।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে একবার বলিয়াছিলেন, "স্থূল অবস্থায় সমস্তই বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ দেখা যায়। স্থূল অবস্থায় যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহা অল্পপরিসরযুক্ত ও তাহার গতি অ-দ্রুত; এইজন্য, ইহার সর্বত্রব্যাপী কোনো শক্তি থাকে না। কিন্তু, মন যখন উচ্চ মার্গে যায় বা কারণ-স্নায়ুতে বা কারণ-শরীরে অবস্থান করে, তখন যে সকল স্পন্দন উঠে, অর্থাৎ, যে সকল চিন্তাশক্তি উঠে, তাহা সমস্ত সৃষ্টিময় পরিব্যাপ্ত হয়, কারণ, চিদাকাশের প্রক্রিয়া স্থূল প্রক্রিয়া হইতে অন্যবিধ।"

বেতার-বার্তা সূক্ষ্ম-স্পন্দনের সামান্য মাত্র পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূক্ষ্ম-স্পন্দন বা সূক্ষ্ম-প্রকম্পন, স্থূল-স্পন্দন অপেক্ষা অধিক শক্তিতে পরিপূর্ণ এবং বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। চিৎ-শক্তিকে যদি আরো

উচ্চে, কারণ-অবস্থায় বা মহাব্যোমে, উঠানো যায়, তাহা হইলে সেই অবস্থায় যে সকল প্রকম্পন বা স্পন্দন উঠিবে, তাহা বিশ্বব্যাপী হইবে। এই স্থলে মনোবিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র একীভূত হইয়া যায়। মানুষের দেহ হইল অতি সূক্ষ্ম জীবন্ত যন্ত্র, যাহার দ্বারা এই সকল সূক্ষ্ম-স্পন্দনের কার্য-কারণ পরীক্ষা করা যাইতে পারে—Human body is the most delicate living instrument for experimenting the finer vibrations and their causes.

স্বামিজী যখন এই সূক্ষ্ম-স্পন্দনের বিষয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তিনি অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছিলেন। সকল বস্তুকেই তিনি যে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি যে বিশ্বব্যাপ্ত, সর্বত্রই রহিয়াছেন ও সর্ব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট—ইহাই তিনি বিশেষ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। আর একটি বক্তৃতায় তিনি এই বিষয় বলিয়াছিলেন, "I am in the Sun, I am in the Moon, I am in the stars, I am everywhere."—অর্থাৎ, আমি সূর্যতে রহিয়াছি, আমি চন্দ্রতে রহিয়াছি—আমি সর্বব্যাপ্ত। আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "I am a voice without form." —আমি বাণী, দেহ নহি।

স্থুল দেহে বা স্থুল স্নায়ুতে এই সকল ভাব বা উক্তি প্রয়োজ্য নয়। কারণ বা মহাকারণে চিৎ-শক্তি উঠিলে, জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতর যে কারণ বা মহাকারণ অন্তর্নিহিত আছে, এবং কারণ বা মহাকারণ হইতেই যে প্রত্যেক বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারাই যে পরিব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে—ইহাই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু যেমন মহাকারণ হইতে আসিয়া স্থুল অবস্থা ধারণ করিয়াছে, তেমন প্রত্যেক বস্তুতেই মহাকারণ

বা আদিকারণ বা আদিশক্তি অন্তর্নিহিতভাবে রহিয়াছে। মানুষের দেহও সেইরূপ আদিকারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া পরিশেষে স্থূল রূপ ধারণ করিয়াছে। কারণ ও মহাকারণে চিৎ-শক্তি তুলিলে, মানুষের দেহ ও অপর সৃষ্ট বস্তুসমূহ সেই একই মহাকারণের বিভিন্ন রূপ বলিয়া পরিগণিত হয়। মহাকারণ হইল, Substratum—আধার। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে ঃ

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাঽসি।"[১]

প্রথম অবস্থায় আমরা দুইটি বস্তুর মধ্যে ব্যবধান দেখিয়া থাকি। 'দুইটি পরমাণু'—এইরূপ শব্দ যদি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে, অতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, মাঝখানে একটি ফাঁক বা ব্যবধান আছে—এই ভাবটি মনে আসিয়া থাকে; আর দুইটি বিন্দুর পৃথক্ Location বা পৃথক্ অবস্থিতি, এবং সীমা ও পরিধির বিষয় স্বতঃই মনে আসে। এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে যাইতে হইলে মাঝখানে একটি শূন্য বা অনিশ্চিত ভাব বা ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। পৌরাণিক ভাষায় ইহাকেই 'ভবসাগর' বলা হইয়াছে। ভবসাগর যে কি করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই ব্যবধানটি কি?—এক বিন্দু অপর বিন্দু হইতে অন্যত্র যাইতেছে, বিপরীত দিকে উভয়ের গতি—ইহাই হইল 'দূরত্ব'। কিন্তু, 'ব্যবধান' হইল সাম্য-অবস্থার কথা, এই স্থলে পরিধির কোনো চিন্তা নাই।

১ তুমিই জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপা, যেহেতু তুমি ক্ষিতিরূপে অবস্থিতি করিতেছ।

দুইটি বিন্দুর সীমাবিবর্জিত ব্যবধান চিন্তা করাও যাহা, আর সমস্ত সৃষ্টি যে অব্যক্তভাবে অবস্থিত, ইহা চিন্তা করাও তাহাই—দুই-ই এক হইয়া যায়। এতদ্-অনুসারে, পরিদৃশ্যমান জগৎ লোপ হইয়া যায়, নিজের দেহও লোপ হইয়া যায়, চিন্তাশক্তিও লোপ হইয়া যায়, মাত্র সত্তা অবস্থান করে। সেই সত্তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং সেই সত্তা হইতেই পুনরায় সমস্ত সৃজন হইতেছে, পুনরায় সেই সত্তাতেই সমস্ত সৃষ্ট বস্তু মিলাইয়া যাইতেছে। দুইটি পরমাণুর মধ্যস্থিত যে ব্যবধান, তাহার সাম্য-অবস্থা চিন্তা করা, এবং সমস্ত জগৎ সৃজন করা—একই হইয়া যায়। এই স্থলে প্রত্যেক বিন্দুই হইল কেন্দ্র, বিশেষ কেন্দ্র কোনো স্থানে নাই—Every point is a centre, nowhere is the centre. কারণ, শক্তি সর্বব্যাপ্ত; শরীরের যে কোনো স্থান দিয়া চিন্তা করা যাইতে পারে, এবং সেই স্থানটি কেন্দ্র হইতে পারে; বিশেষ কেন্দ্র বলিয়া কিছুই থাকে না। এইসকল হইল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত। ইহা যদিও জটিল, কিন্তু ইহা প্রকৃতরূপে সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবে পরিদর্শন করিতে সাহায্য করে।

অতি সূক্ষ্ম বা কারণ অবস্থায় সমগ্র সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া থাকে, সংলগ্ন হইয়া থাকে; একে অন্যের সহিত অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য, এক জায়গায় স্পন্দন উঠিলে, অপর এক জায়গায় স্পন্দন প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হয়। যাহা কারণ ও মহাকারণে স্পন্দিত হয়, অবশেষে তাহা স্থূলে পরিব্যাপ্ত হয়। পরমহংস মশাই-এর গায়ে যে কেন প্রহারের দাগ পড়িয়াছিল, বা স্বামিজীর কোমরে যে কেন ব্যথা লাগিয়াছিল, ইহাতে তাহা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। স্বামিজী যে মহাকারণ-

স্পন্দনের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বর্ণিত ঘটনা দুইটি তাহার স্পষ্ট উদাহরণ।

কারণ ও মহাকারণের প্রক্রিয়া পরমহংস মশাই-এর স্থূল দেহে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। মাঝীর ও তাঁহার দেহের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাহা শূন্য নয়, তাহা সংযোজক শক্তিতে পরিপূর্ণ। এইজন্য, এক কেন্দ্রের স্পন্দন অপর কেন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হইল। পরমহংস মশাই যে কত উচ্চ অবস্থায় উঠিয়াছিলেন, তাহা ঘটনাটিতে প্রতীয়মান হয়।

চিন্ময়ী—মৃন্ময়ী

সাধারণ লোক প্রস্তরনির্মিত কালী-বিগ্রহকে পাষাণময়ী বলিয়া থাকে। ভাস্কর এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া বাটালি দিয়া খোদিত করিয়া এই মূর্তি নির্মাণ করিয়াছে, এইজন্য, ইহা জড় প্রস্তর-মূর্তি, আর কিছুই নয়—এ কথা বলিলে কোনোই ভুল হয় না, কারণ, স্থূলস্নায়ুর প্রক্রিয়া হইল এইরূপ। স্থূল-স্নায়ুর প্রকম্পনের জন্য আমরা বস্তুকে 'স্থূল', 'জড়', 'সীমাবদ্ধ' প্রভৃতি বহুপ্রকার দেখিয়া থাকি। এইজন্য, সাধারণতঃ, আমরা বস্তু-নির্ণয়কালে সীমাবদ্ধ ক-একটি গুণের উল্লেখ করিয়া থাকি। ইহা ভ্রান্ত মনের কার্য নয়। ইহা ঠিক কথা; কারণ, স্থূল অবস্থাতে এইরূপ পরিদর্শন হয়। কিন্তু, সূক্ষ্ম-স্নায়ু দিয়া বা বিদেহ-অবস্থা হইতে জগৎকে দেখিলে অন্যবিধ ভাব হইয়া থাকে, কারণ, দ্রষ্টা তখন চিন্ময় হইয়া যান এবং জগৎকেও চিন্ময় দেখেন। বৈষ্ণবদিগের একটি বাণী আছে:

"চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম।"

অর্থাৎ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি, তিনি চিন্ময়, জগৎ বা সৃষ্টি চিন্ময়, এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু, অর্থাৎ, যাহার নাম ও রূপ আছে, তাহাও চিন্ময়।

পরমহংস মশাই অতি সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা কারণ-স্নায়ু দিয়া তাঁহার চিৎ-শক্তি প্রধাবিত করিয়াছিলেন, এইজন্য, তিনি একখানি প্রস্তরখণ্ডকে চিন্ময়ী বলিলেন, এবং বিড়ালের ভিতরও সেই চিন্ময়ীকে দেখিলেন। তিনি এত উচ্চ অবস্থায় বা সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে গিয়াছিলেন যে, গাছের পাতা ও ঘাসেতেও সেই চিন্ময়ীকে দেখিতেন। পরমহংস মশাই-এর যে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে। ইহা উপহাস বা উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। ইহা হইল অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অবস্থা। সংজ্ঞাক্ষেত্রের উর্ধ্বতম অবস্থা হইল অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের অবস্থা। আমাদের স্থূল-স্নায়ু দিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা নিতান্ত খণ্ড ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু, চিৎ-শক্তি যখন সূক্ষ্ম বা কারণ স্নায়ুতে প্রধাবিত হয়, তখন দূরত্ব, পরিধি ও কাল—এ সব কোনো প্রতিবন্ধ থাকে না; খণ্ড হইতে অখণ্ড বা পূর্ণত্বে আসিবার প্রয়াস হয়, এবং অন্য প্রকার গুণ উপলব্ধি হয় বা দর্শন হয়। এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান চিত্তবৃত্তিকে অন্যত্র লইয়া যায়। ইহা যে কি অবস্থা, সাধারণ ক্ষেত্র হইতে তাহা উপলব্ধি করা যায় না।

স্বামিজীরও এই অবস্থা বহুবার দেখিয়াছি; ব্রহ্মানন্দেরও এই অবস্থা বিশেষভাবে দেখিয়াছি। সাধারণ লোকের ইহা অনুকরণ করা উচিত নয়। সাধারণ লোক ইহা অনুকরণ করিলে বাতুল বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং তাহাকে বায়ু-গ্রস্ত বলিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক হইবে। পরমহংস মশাই, স্বামিজী এবং ব্রহ্মানন্দ এই অবস্থায় অন্যান্য বিষয়েও পারম্পর্য ও সংশ্লিষ্ট ভাব রাখিয়াছিলেন; কিন্তু, বায়ুগ্রস্ত ও বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় সকল বিষয়ে পারম্পর্য বা সংশ্লিষ্ট ভাব রাখিতে পারে না। বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি অপরের অনুকরণ করিতে পারে মাত্র।

শক্তি-বিকিরণে

পরমহংস মশাই-এর গা হইতে এক প্রকার আভা—Effluvium বা Halo বাহির হইত। ইহা উপস্থিত সকল ব্যক্তি অনুভব করিতেন। অবশ্য, ইহা সব সময় বাহির হইত না। তিনি যখন সাধারণ অবস্থায় থাকিতেন, তখন ইহা অনুভব করিতাম না; কিন্তু তিনি যখন উচ্চ অবস্থায় উঠিতেন বা সমাধিস্থ হইতেন, তখন এই আভা বা শক্তি বাহির হইত, এবং আমরা তাহা অনুভব করিতাম।

নিম্ন-শ্রেণীর ভালবাসা হইল দৈহিক বা স্বার্থপূর্ণ। এক দেহ হইতে আর এক দেহে যে শক্তি যাইতেছে, তাহাকে 'ভালবাসা' বলে। দুই বন্ধু একত্র বাস করিলে তাহাদের ভিতর একটা ভালবাসা হয়। কখনো বা দেখা যায় যে, দুই জন ব্যবসা করিবে—সেইজন্য পরস্পরে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, কিন্তু ক-এক দিন পর সেই ভালবাসা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইয়া বিদ্বেষে পরিণত হয়। ইহা হইল দৈহিক বা স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা। স্বার্থপূর্ণ ভালবাসার গতি হইল Straight line-এ—সরল রেখায়। ইহাতে অল্পকাল পরেই প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে; কারণ, গতিবাদ-এর নিয়ম অনুযায়ী সরল রেখা বহুকাল যাবৎ ঋজু পথে চলিতে পারে না, অল্পকাল পরে অনৃজু পথে চলিয়া থাকে। সরল রেখা হইল বক্র রেখার ন্যূনতম অংশ।

উচ্চ-অঙ্গের ভালবাসা অন্য প্রকার। নিজের মন হইতে ইষ্ট-তে এক শক্তির গতি হয়, এবং ইষ্ট হইতে অপর ব্যক্তির প্রতি সেই শক্তি প্রধাবিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। আমি ইষ্টকে ভালবাসি ও ভক্তি করি, এবং ইষ্ট অপর ব্যক্তিকে ভালবাসেন; এইজন্য, আমিও সেই অপর ব্যক্তিকে ভালবাসি। ইহাকে দার্শনিক ভাষায় 'ভালবাসার ত্রিকোণ-মূর্তি'—Triangle of

Love বলা হয়। ইহার গতি ঠিক একটি Parabola—অধিবৃত্ত বা বিস্ফারিত বর্তুলের ন্যায় হইয়া থাকে। অহং, ব্রহ্ম ও জীব—এই হইল তিনটি কোণ। আমি বল্লভকে ভালবাসি, বল্লভ অপরকে ভালবাসেন; এইজন্য, বল্লভের জন বলিয়া আমি অপরকে ভালবাসি। আমি অপর ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছি না, আমি জগৎকে ভালবাসিতেছি না; কিন্তু, বল্লভের জন, বল্লভের জগৎ—এইজন্য, সেই লোক ও জগৎকে ভালবাসিতেছি।

ভক্তির ভাব দিয়া বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে যে, পরমহংস মশাই-এর আত্মগোষ্ঠীর ভিতর যে পরস্পরের প্রতি অত ভালবাসা, তাহা বল্লভের জন্যই হইত, কারণ প্রত্যেকেই ছিল বল্লভের আশ্রিত।

দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক মত দিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গা হইতে যে শক্তি নির্গত হয়, তাহা বহু স্তরের হইয়া থাকে। ত্বকের উপরিভাগে এক প্রকার শক্তি আছে, তাহাকে Enveloping energy—'আবরণী-শক্তি' বলে। ত্বকের সংশ্লিষ্ট যে শক্তি, তাহাকে Peripheral energy—'ত্বক্-শক্তি' বলে। ইহার অভ্যন্তরে হইল Preservative energy—'সংরক্ষণী-শক্তি'। ইহারও অভ্যন্তরে আরো অনেক প্রকার সূক্ষ্ম শক্তি আছে। আবরণী-শক্তি সাধারণ লোকের চর্মের উপর আড়াই ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে। এক ব্যক্তির খুব নিকটে অপর কোনো ব্যক্তি বসিলে, সে একটু বিরক্ত হইয়া উঠে, বলে—"গা ঘেঁসে বসলে কেন?" অনুমান করা যাইতে পারে যে, উভয়ের চর্ম-পরিধির মধ্যে অন্ততঃ ছয় ইঞ্চি ব্যবধান থাকে, কিন্তু উভয়ের এই আবরণী-শক্তির সংঘর্ষণ ও সংযোগ হওয়ায় এইরূপ বিরক্তির ভাব আসিয়া থাকে। কদাচারী ও কুচিন্তা-

পূর্ণ ব্যক্তিদিগের আবরণী-শক্তির বর্ণ মলিন বা কালো হইয়া থাকে—চলিত কথায় যেমন বলে, "তোমার মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়েছে।" সাধারণ অবস্থায়, এই আবরণী-শক্তির বর্ণ ধূসর বা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এইজন্য, অনেক সময় লোকের মুখ চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হয়, যেন মুখ হইতে একটা দীপ্তি বাহির হইতেছে।

এ সকলই হইল বাহ্যিক বিকাশ বা স্থুল-স্নায়ুর প্রক্রিয়া; কিন্তু, মন বা শক্তি যখন স্থুল-স্নায়ু হইতে সূক্ষ্ম-স্নায়ু, কারণ-স্নায়ু, বা মহাকারণ-স্নায়ুতে অন্তর্মুখী হইয়া প্রধাবিত হয়, তখন এই শক্তি অপর এক রূপ ধারণ করে।

স্পন্দনবাদের নিয়ম হইল: স্পন্দন যখন অতি স্থুলভাবে হয়, তখন তাহার পরিধি অল্পপরিসরযুক্ত হয়; আর, স্পন্দন যখন অতি সূক্ষ্মভাবে হয়, তখন তাহার গতি ও পরিধি বহু দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়—Grosser the vibration shorter the range, fiiner the vibration longer the range. মন বা শক্তি সাধারণ অবস্থায় স্থুল-স্নায়ুতে থাকে। কিন্তু, মন যখন অন্তর্মুখী হইয়া সূক্ষ্ম-স্নায়ু দিয়া প্রধাবিত হয়, তখন তাহার বাহিরের প্রক্রিয়াও সেইরূপ পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে; কারণ, সাধারণতঃ, শক্তির গতি হইল বহির্মুখী বা বিকাশ-মুখী। মনকে যে পরিমাণে অন্তর্মুখী করা যাইবে, বিকাশ-কালে, সেই পরিমাণে বহির্মুখী হইবে। ইহাকে সূক্ষ্ম-স্পন্দন, সূক্ষ্ম-দেহ, বা কারণ-দেহ বলা হয়। সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা কারণ-স্নায়ু হইতে, বা সূক্ষ্ম-শরীর বা কারণ-শরীর হইতে শক্তি উৎপাদন করিয়া বিস্তার করিলে সকলেই তন্ময় ও পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

স্বামিজী লণ্ডনে বক্তৃতাকালে কাঠের মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বুকে হাত দিয়া প্রথমে খানিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতেন,

তাহার পর, একটু পদচারণ করিয়া দৃঢ়পদে এক জায়গায় দণ্ডায়মান হইতেন। সেই সময় তাঁহার মুখের ও চোখের সমস্ত স্নায়ু পরিবর্তিত হইয়া যাইত, এবং তিনি যেন অন্য এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। ধীরে ধীরে তাঁহার কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হইত। কণ্ঠস্বরের এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, বহু দূরের ব্যক্তিও নিকটের ব্যক্তির মতো সমানভাবে তাহা শুনিতে পাইত। এই কণ্ঠস্বর 'সাম্যস্পন্দন' হইতে উদ্ভূত। স্বামিজী কখনো কখনো বলিতেন, "আমি নিজের শরীর থেকে একটি শক্তি উৎপন্ন করে সেটি শ্রোতাদের ওপর বিস্তার করি। শ্রোতারা আমার অঙ্গবিশেষ হয়ে যায়। আমার মনঃশক্তি শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করি। শ্রোতাদের মন আমার মন বা শক্তির সঙ্গে সংমিশ্রণ করি।" তিনি কৌতুক-চ্ছলে ইহাও বলিতেন, "সকলের মনগুলো আমার মনের সঙ্গে এক রঙে রঙিয়ে নি।" যাহা হউক, এইরূপ অবস্থায় তিনি যাহা বলিতেন, সকলেই তাহা গ্রহণ করিত; দুই মন বা দুই চিন্তা থাকিত না।

পরমহংস মশাই-এর এই শক্তি অতি অদ্ভুত পরিমাণে ছিল। সাধারণ অবস্থায় তাঁহাকে অতি সামান্য লোকের মতো দেখা যাইত, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি এত উপরে উঠিয়া যাইতেন যে, তাঁহার Altitude—উচ্চতা, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম মাত্র। তিনি শব্দ, চিন্তা, দ্বন্দ্বভাব, Relative idea বা সাপেক্ষ ভাব প্রভৃতির কত উচ্চে যে উঠিতেন, এবং কত সূক্ষ্ম স্নায়ু দিয়া যে শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেন, তাহা কিছু বলা যায় না।

সর্ব দেশের ভাষাতেই এইরূপ শব্দ পাওয়া যায়, ভাল লোক, সৎ লোক, সাধু লোক, মহাপুরুষ লোক, মহাত্মা

লোক ও অবতার লোক, প্রভৃতি। এই যে গুণবিভাগ, ইহার মাপকাঠি কি? ভাষাতেই বা এরূপ শব্দসকল আসিল কেন?—ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, বিভিন্ন প্রকার স্নায়ুর বিভিন্ন প্রকার প্রকম্পনের জন্য এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির এইরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে। দেখা যায় যে, স্থূল-স্নায়ু হইতে যে স্পন্দন বা শক্তি বহির্গত হয়, তাহা অতি নিম্ন স্তরের প্রক্রিয়া, এবং স্থূল, অল্পপরিসর-যুক্ত ও অল্পকালস্থায়ী বা দেশ, কাল ও নিমিত্তের অধীন। কিন্তু, স্থূল-স্নায়ু অতিক্রম করিয়া মনোবৃত্তি যেরূপ সূক্ষ্ম-স্নায়ুতে প্রধাবিত হইবে, তাহার বহির্বিকাশের পরিধিও সেইরূপ হইবে।

স্বামিজী একবার বলিয়াছিলেন, "I conquered America before I visited the country"—আমি আমেরিকা দর্শন করিবার পূর্বেই আমেরিকাকে জয় করিয়াছিলাম। অর্থাৎ, তিনি সূক্ষ্ম-শক্তি বা মহাকারণ-শক্তি বা মহাকারণ-দেহ বিস্তার করিয়া সমস্ত আমেরিকা দেশটিকে আবরণ করিয়াছিলেন; পরে, স্থূল-শরীরে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন মাত্র।

পরমহংস মশাই-এর এই কারণ-শরীর বা মহাকারণ-শরীর যে কত বিস্তৃতি লাভ করিবে, তাহা এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তাঁহার শরীর হইতে কী যে একটি আভা বা শক্তি বাহির হইত, তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতাম ও তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতাম। কিন্তু, সেই সূক্ষ্ম-স্পন্দন, কারণ-শরীর বা মহাকারণ-শরীর ভবিষ্যতে যে বিস্তৃতি লাভ করিবে, তাহা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

হাসি-তামাশায়

পরমহংস মশাই বড় হাসি-তামাশার লোক ছিলেন। অতি

অদ্ভুত তাঁহার হাসি-তামাশা করিবার ক্ষমতা ছিল। অতি নূতন রকমের তামাশা করিতে ও অতি নূতন রকমের উদাহরণ দিতে তিনি পারিতেন। কোনো রকম একঘেয়ে ভাব, গোঁড়ামি, সংকীর্ণভাব বা গুরুগিরির ভাব তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না; এ সকল অতিশয় ঘৃণা করিতেন। কেহ যদি গোঁড়ামি করিত বা সংকীর্ণভাবে কথা বলিত, তাহা হইলে তিনি নিজের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় একটি উপাখ্যান তুলিয়া উত্তর দিতেন। অনেক সময় উত্তর দেওয়ার ভাষা কলিকাতার সমাজের রুচিবিগর্হিত হইত বটে, কিন্তু উত্তরের উদ্দেশ্য হইত অতি সুন্দর এবং তাৎপর্যও হইত অতীব নিগূঢ়। সাধারণ লোকে উহার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া শক্তির অপব্যয় করিবে, এবং কি উদ্দেশ্যে পরমহংস মশাই এইরূপ কড়াভাবের হাসি-তামাশা করিতেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহার কদর্থ করিবে, এইজন্য, ইচ্ছাপূর্বক, এ সম্বন্ধে সে সকল কথা পরিত্যাগ করিলাম।

এই হাসি-তামাশা তাঁহার এক বিশেষ অস্ত্রস্বরূপ ছিল। ব্যঙ্গচ্ছলে এমন একটি উপস্থিত উদাহরণ তিনি দিতেন যে, শ্রোতারা একেবারে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইয়া যাইত। এইরূপ অদ্ভুত কৌতুকের ক্ষমতা থাকায়, কলিকাতার শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ, সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে ধর্ম-কর্ম হইল কতকগুলি শুষ্ক ও গম্ভীর নিয়ম পালন করা মাত্র—ধর্ম-কর্মে হাসি-তামাশা বা চাপল্য ভাবের কোনো রেখা পর্যন্ত থাকিবে না।

পরমহংস মশাই এক দিন যুবকবৃন্দকে লইয়া খুব হাসি-তামাশা করিতেছিলেন। যুবকদিগের মধ্যে কাহারো নূতন বিবাহ হইয়াছে, কাহারো বা বিবাহের কথা চলিতেছে। তিনি সেই সকল বিষয় লইয়া একেবারেই যুবকদিগের মতো হাসি-

তামাশা করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরমহংস মশাইকে বলিলেন, "ছেলেরা দূর থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে, ওদের দুটো ভাল কথা বলুন, শুধু হাসি-তামাশাই করছেন!" পরমহংস মশাই অমনি উত্তর করিলেন, "তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের ওই একটা দোষ, ছেলেবেলা থেকেই হবিষ্যি খাওয়ার ধাত!" কথাগুলির ভাবটা এই যে, তোমরা মনের ও জগতের এক দিক্ মাত্র দেখাইতেছ, কিন্তু অপর দিক্‌ও যে একটি আছে, তাহার কোনো উল্লেখই করিতেছ না। এইজন্য, তোমাদের ভিতর তেমন শক্তি আসিবে না। ইহাতে মনের প্রকৃত বৃদ্ধি হয় না, মন সজীব হয় না। এক দিকে যেমন ভাল ভাব দেখাইতে হয়, অপর দিকে তেমনি বিপরীত ভাবও দেখাইতে হয়—এই হইল প্রকৃত সাধনমার্গ।

স্বামিজীর ভিতরও হাসি-কৌতুকের ক্ষমতা অদ্ভুতরূপে ছিল। ইহা তাঁহার স্বভাবজাত ও বংশগত। Pointed repartee—চট্‌পট সুতীক্ষ্ণ ও সরস উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা স্বামিজীর ভিতর বিশেষভাবে ছিল, এইজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অল্পতেই বিধ্বস্ত হইয়া পড়িত। মনোবিজ্ঞানের পর্যায় ক্রমোন্নতির ইহা একটি বিশেষ নিদর্শন।

প্রবাদ আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব খুব হাসি-কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। আর ইহাই সম্ভব; কারণ তীক্ষ্ণ, মেধাবী ও নৈয়ায়িক মনের অপর দিক্—অর্থাৎ, ব্যঙ্গ-কৌতুকের দিক্‌টিও পরিবর্ধিত হইবেই। যেমন এক দিকে তর্ক-যুক্তির ক্ষমতা থাকিবে, অপর দিকে তেমনি ব্যঙ্গ-কৌতুকের ক্ষমতা থাকিবে। গোমরামুখো বোদা লোকের কোনো দিক্‌টাই খুলে না। কিন্তু, গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের এই সকল হাসি-তামাশার বিষয় বিশেষ কিছুই লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, শুধু তাঁহার এক

দিক্‌টাই বেশী দেখানো হইয়াছে। রাঢ়দেশের, অর্থাৎ, গঙ্গা-তীরবাসী লোকদিগের ভিতর যে এত হাসি-তামাশা দেখা যায় তাহা, সম্ভবতঃ, শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শতেই হইয়াছে।

বৌদ্ধ গ্রন্থে মাত্র সামান্যভাবে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেবও নাকি হাসি-কৌতুক করিতেন। ইহা খুবই সম্ভব; কারণ, তীক্ষ্ণ মেধাবী ব্যক্তির হাসি-কৌতুকের ক্ষমতা মনোবৃত্তির একটি বিশেষ অঙ্গস্বরূপ। Witticism is the sign of intelligence—রঙ্গরস করা তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। বৌদ্ধ গ্রন্থেও কিন্তু বুদ্ধদেব যে কিরূপভাবে হাসি-কৌতুক করিতেন, তাহার কোনো উল্লেখ নাই। কেবল ইহাই বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব একজন স্থির, ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক, হাসি-তামাশার ধার দিয়াও তিনি যান না। কিন্তু, মনোবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, ইহা কখনো হয় নাই, সম্ভবও নয়।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ হইল ক্ষুদ্র, যাহাকে বলে—হাতি-চোখ। মুখে বিশেষ ওজস্বী ভাব নাই; বাহু-সঞ্চালন অতি ধীর ও করুণাব্যঞ্জক। সাধারণ অবস্থায় কণ্ঠস্বর মৃদু, এক প্রকার কাতর স্বর বলা যাইতে পারে। দেখিলে বোধ হয়, যেন জগতের সম্পর্ক হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র থাকিবার—নিরিবিলি বা একাকী থাকিবার তাঁহার ইচ্ছা, জগৎ যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে।

বিবেকানন্দের চোখ হইল বিস্ফারিত; দৃষ্টি—তীক্ষ্ণ; মুখ—সুডৌল, পুরুষ্ট। মুখে আজ্ঞাপ্রদ ভাব, Defiant attitude—বাধাবিঘ্ন-তুচ্ছকারী ভাব, যেন জগৎকে গ্রাহ্যই করিতেছে না। বাহু-সঞ্চালন ও তর্জনী-নির্দেশ যেন জগৎকে শাসন

করিবার বা আজ্ঞা দিবার মতো, যাহাকে বলে নাপোলিওঁ-র মতো অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গ-সঞ্চালন, আজ্ঞা শুনিয়া যেন সকলে স্তব্ধ হইয়া যাইবে।—প্রথম দৃষ্টিতে দুই জনের ভিতর এই পার্থক্য দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিশেষ লক্ষণ হইল—বহুবিধ স্নায়ু দিয়া বহু প্রকার চিন্তা করা। শক্তি-বিকাশ করা বা যাহাতে ক্ষাত্রশক্তির আবশ্যক, এইরূপ কার্য তাঁহার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের হইল গভীর চিন্তা করা মুখ্য, শক্তি-বিকাশ করা গৌণ। এইজন্য প্রথম অবস্থায় সাধারণ লোক তাঁহাকে কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া উন্মাদ ও বাতুল বলিয়া বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করিত।

বিবেকানন্দের হইল শক্তি-বিকাশ করাই মুখ্য, গভীর চিন্তা করা হইল গৌণ।

এই দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া উভয়ের জীবনী আলোচনা করিলে, উভয় ব্যক্তির মধ্যে বেশ একটি সামঞ্জস্য দেখা যায়। এ স্থলে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অনুকরণ করেন নাই। এক জন অপরের অনুকরণ করিয়াছিলেন—ইহা অতীব ভুল মত। উভয়েই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন। পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল; কিন্তু উভয়ের কার্যক্ষেত্র ও বিকাশ-প্রণালী ভিন্ন ছিল। উভয়েই নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। উভয়েই জগৎকে এবং জগতের সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট ভাবসমূহ নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উভয়েই নিজ ভাবে জগতের প্রশ্নসকল মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ শক্তি-বিকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ তেজঃপূর্ণ, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা কেহ কাহাকেও অনুকরণ করিতে পারেন না। নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই হইল এইরূপ পুরুষদিগের বৃত্তি।

মনোবিজ্ঞান দিয়া বুঝিতে হইলে দেখা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব হইল ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে চলিয়া যাওয়া। বিবেকানন্দের ভাব হইল অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে চলিয়া আসা। শ্রীরামকৃষ্ণের হইল ঈশ্বর কেন্দ্র, জীব বা মনুষ্য পরিধি। বিবেকানন্দের হইল জীব বা মনুষ্য কেন্দ্র, ঈশ্বর পরিধি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, যদি দুই জনের মধ্যে এই সব বিষয়ের পার্থক্য থাকে, তবে উভয়ের ভিতর সামঞ্জস্য কোথায়?

ইহা জানা আবশ্যক যে, শক্তির প্রবাহ যদি কেন্দ্র হইতে খুব গভীর স্তরে যায়, তাহা হইলে উপবৃত্ত—Ellipse হইয়া তাহার বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ উপবৃত্ত হইয়া শক্তি পুনরায় নিজ কেন্দ্রে বা প্রাথমিক অবস্থা, বিন্দু-তে, উপনীত হয়। যে শক্তি বহির্মুখী বা বিকাশমুখী হইয়াছিল, তাহা উপবৃত্তের আকারে প্রধাবিত হইয়া পুনরায় নিজ কেন্দ্র বা প্রাথমিক অবস্থা, বিন্দু-তে, প্রশমিত হয়। ইহা হইল Theory of Motion—গতিবাদ-এর নিয়ম। এই নিয়ম সূক্ষ্ম-স্নায়ু বা সূক্ষ্ম-শরীর সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর কেন্দ্র হইলেও, জীব-এও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় বা ঈশ্বর-দর্শন হয়; এবং, বিবেকানন্দের জীব বা মনুষ্য কেন্দ্র হইলেও, পরিশেষে, জীব-এও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় বা ঈশ্বর-দর্শন হয়। দর্শনশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র—এই দুই শাস্ত্র দিয়া পর্যালোচনা করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্নায়ু-প্রক্রিয়া এবং বিবেকানন্দের লণ্ডনে বক্তৃতাকালে স্নায়ু-প্রক্রিয়ার বিষয় অনুধাবন করিলে অসংকোচ-চিত্তে বলা যায় যে, য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র ও শারীরবিজ্ঞান ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের কাছে শিশুপাঠ্য পুস্তকসদৃশ।

দর্শনশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে সকল জটিল প্রশ্ন আছে, এবং স্পন্দনবাদ ও স্নায়ু-প্রক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল অতি দুরূহ বিষয় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে, পরমহংস মশাই-এর দেহের প্রক্রিয়া, চিন্তাশক্তি ও শক্তি-বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, সে সকল জটিল বিষয়ের অতি সহজ সমাধান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ, স্নায়ু-গতি ও স্নায়ুসঞ্চালনের বিষয় চিন্তা করিলে, জগতের দর্শন-শাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র নূতন প্রকারে লিখিতে হইবে, এবং বহু প্রাচীন মত, যাহা য়ুরোপীয়েরা পোষণ করেন, পরিবর্তন করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। আমি এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক—দর্শনশাস্ত্রের ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া অভিহিত করি। ভবিষ্যতে, জগতে যে দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র নূতন প্রণালীতে লিখিত হইবে, এই মহাপুরুষই হইলেন তাহার আদর্শ। ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র—এই তিন শাস্ত্রই যে অভিন্ন, এক-ই, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জগৎকে দেখাইয়াছেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ভ্রম সংশোধন

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা ২৭, লাইন ২২	উঠিত	উঠিতে
,, ১২৩, পাদটীকা	বদিক	বৈদিক
,, ১২৪, লাইন ২১	নিবিকল্প	নিবিকল্প
,, ১৩৭, লাইন ১৬	শাক্ত	শক্তি
,, ১৪৬, শেষ লাইন	থুমরার	মথুরার

১

গ্রন্থকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

	টা	আ	পাই
*১। অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান			
২। মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১	৪	০
৩। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	০	৮	০
৪। সাধুচতুষ্টয়	০	১২	০
৫। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ	২	০	০
*৬। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)			
৭। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩	০	০
৮। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (যন্ত্রস্থ)			
৯। ব্রজধাম দর্শন	১	৮	০
১০। বদরীনারায়ণের পথে	২	৪	০
১১। নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১	০	০
১২। মায়াবতীর পথে	১	০	০
১৩। মাতৃদ্বয়	০	৪	০
১৪। মাষ্টার মহাশয়	০	১২	০
*১৫। বৃহন্নলা			
*১৬। উষা ও অনিরুদ্ধ			
১৭। পাশুপত অস্ত্রলাভ	৫	০	০
১৮। গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	১	৮	০
১৯। খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার	০	২	০
২০। ঐ (নেপালী অনুবাদ)	০	১	৬

		Rs.	As.	P.
1.	Natural Religion	1	0	0
2.	Energy	1	0	0
3.	Mind	1	0	0
*4.	Metaphysics			
*5.	Reflections on Woman			
*6.	Dissertation on Painting			
7.	Principles of Architecture	2	8	0
*8.	Appreciation of Michael Dutt and Dinabandhu			
*9.	Kurukshetra			
10.	Lectures on Status of Toilers	2	0	0
11.	Homocentric Civilization	1	8	0
*12.	Status of Women (with Bengali Translation)			
13.	Lectures on Education	1	4	0
14.	Federated Asia	4	8	0
15.	National Wealth	5	8	0
16.	Nation	2	0	0
17.	New Asia	1	0	0
18	Nari-Adhikar (Translation of 'Status of Women' in Hindi)	0	12	0

Allied Publications

		Rs.	As.	P.
1.	Dialectics of Land-Economics of India By Dr. B. N. Datta	6	8	0
2.	Education in Free India By R. K. Ghosh	0	6	0
3.	Labour & Capital By R. K. Ghosh	1	0	0
4.	Toilers' Republic	0	8	0
5.	কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক প্রণীত	2	8	0

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না